



Co-funded by
the European Union



Kingdom of the Netherlands



বিইএফ সদস্যদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক

▶ বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ
প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

সূচিপত্র

১. শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩
১.১ বিরোধের অনিবার্যতা	৩
১.২ শ্রম বিরোধের ধরন ও কারণসমূহ	৩
১.৩ শ্রম বিরোধের সংজ্ঞা ও ধরনসমূহ	৪
১.৪ শিল্প সম্পর্কে কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তির গুরুত্ব	৫
১.৪.১ স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল কর্মপরিবেশ উন্নীতকরণ	৬
১.৪.২ বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং ন্যায্য ফলাফল নিশ্চিতকরণ	৬
১.৪.৩ আস্থা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি	৬
১.৪.৪ কমপ্লয়েস নিশ্চিতকরণ এবং আইন মেনে চলা এবং অধিকার রক্ষা করা	৬
১.৪.৫ কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার নির্দিষ্ট উপাদানসমূহ	৬
১.৫ শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির মূলনীতিসমূহ	৭
২. শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তির গুরুত্ব	৮
২.১ শ্রম পরিদর্শন ও বিরোধ প্রতিরোধ	৮
২.২ কর্মক্ষেত্রে শ্রম বিরোধের প্রভাব	১০
২.৩ সংঘাতের প্রতি সাধারণ প্রতিক্রিয়া	১২
২.৪ শ্রম বিরোধ প্রতিরোধের গুরুত্ব	১৩
২.৪.১ যৌথ দরকষাকষি	১৩
২.৪.২ কর্মক্ষেত্র সহযোগিতা	১৪
২.৪.৩ অভিযোগ পদ্ধতি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	১৫
২.৪.৪ সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	২১
২.৫ বাহ্যিক শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার গুরুত্ব	২৩
৩. বাংলাদেশে আইনি কাঠামো	২৪
৩.১ বিরোধ নিষ্পত্তি-সম্পর্কিত শ্রম আইন, ২০০৬-এর বিধানসমূহ	২৪
৩.২ মালিক ও শ্রমিকের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা	৩২
৩.২.১ মালিকের বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্ব	৩২
৩.২.২ মালিকের অধিকার	৩৪
৩.২.৩ শ্রমিকের অধিকার	৩৪
৩.২.৪ শ্রমিকের বাধ্যবাধকতা	৩৫
৩.২.৫ অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য সম্পর্কিত মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি	৩৬

৪. কর্মক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তি	৩৯
৪.১ সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক এবং বিরোধ নিষ্পত্তি	৩৯
৪.২ যৌথ দরকষাকষি এবং বিরোধ নিষ্পত্তি	৪০
৪.২.১ যৌথ দরকষাকষি এবং বিরোধ প্রতিরোধ	৪১
৪.২.২ যৌথ দরকষাকষি এবং বিরোধ নিষ্পত্তি	৪২
৪.৩ কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি	৪২
৪.৪ সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (আইসিএমএস)	৪৪
৫. মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া	৪৬
৫.১ মধ্যস্থতার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য	৪৬
৫.২ মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব	৪৮
৫.৩ মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, যার মধ্যে বিরোধ শুরু করা, অনুসন্ধান, পক্ষগুলোকে সম্পৃক্ত করা এবং নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত	৫১
৬. সালিশি প্রক্রিয়া	৫৩
৬.১ সালিশির সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য	৫৩
৬.২ সালিশিকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব	৫৪
৬.৩ সালিশি প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, যার মধ্যে সালিশিতে যাওয়ার চুক্তি, সালিশিকারী নিয়োগ, শুনানি পরিচালনা এবং রায় কার্যকর করা ইত্যাদি বিষয়গুলো রয়েছে	৫৫



১. শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.১ বিরোধের অনিবার্যতা

“শিল্প সম্পর্ক” ধারণাটি কর্মক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিক এবং তাঁদের নিজ নিজ সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত - যা সরকারি হস্তক্ষেপ দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এটি বিভিন্ন স্তরে সংঘটিত হতে পারে। যেমন- কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিক এবং তাঁর মালিকের মধ্যে; শ্রমিকদের একটি দল বা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন এবং একজন পৃথক মালিকের মধ্যে; শিল্প বা খাতভিত্তিক স্তরে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং মালিকদের কোনো সংগঠনের মধ্যে; এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিক ও মালিকদের শীর্ষ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে।

পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন বা স্তর যাই হোক না কেন, শ্রমিক ও মালিক এবং তাঁদের নিজ নিজ সংগঠনের মধ্যে একই সঙ্গে অভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী-উভয় ধরনের স্বার্থ বিদ্যমান থাকে। তাই কর্মক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে, কর্মসংস্থান সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই এমন যে, কিছু বিরোধ বা মতপার্থক্য অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক মতপার্থক্য, অসন্তোষ, উত্তেজনা ও বিরোধ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। তবে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে কিছুটা মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য। শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হয় যে, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থ সব সময় এক হবে না। তাই অনিবার্য মতপার্থক্য ও বিরোধকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করাই সুন্দর শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার মূল লক্ষ্য।

সহজভাবে বলতে গেলে, দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য বা স্বার্থের বিরোধকেই দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বলা যায়। যখন এই বিরোধ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সৃষ্টি হয়, তখন তাকে শিল্প সংঘাত, শ্রম সংঘাত বা শিল্প বিরোধ বলা হয়। সংঘাত বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে এবং অনেক সময় তা বিরোধ বা বিরোধের পরিস্থিতিতে রূপ নেয়।

১.২ শ্রম বিরোধের ধরন ও কারণসমূহ

শ্রম বিরোধ ছোট বা বড়, ব্যক্তিগত বা যৌথ, একটি কর্মস্থলে সীমাবদ্ধ অথবা বহু প্রতিষ্ঠান জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে। এসব বিরোধের কারণ বহু ও বৈচিত্র্যময়। যেমন- একজন শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি নিয়ে সাধারণ অভিযোগ থেকে শুরু করে, অনিরাপদ বা অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিয়ে শ্রমিকদের একটি দলের অভিযোগ, কিংবা নিজেদের স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি ইউনিয়ন গঠনে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কর্মক্ষেত্রে সব শ্রমিকের কর্মবিরতি পর্যন্ত এটা গড়াতে পারে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

কিছু বিরোধ খুব দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়, যদি শুরুতেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশেষ করে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সুপারভাইজার কোনো একজন শ্রমিককে তাঁর মজুরি দ্বিগুণ মজুরি কীভাবে হিসাব করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন, এবং শ্রমিক সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন তাহলে সম্ভাব্য সমস্যাটি ঘটনাস্থলেই সমাধান হয়ে যায়। এটি বিরোধে রূপ নেওয়া প্রতিরোধ করে এবং মতভেদের অবসান ঘটায়।

তবে কিছু বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বেশি সময় লাগে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিকদের একটি দলের অনিরাপদ বা অস্বাস্থ্যকর কর্মব্যবস্থা সম্পর্কিত অভিযোগ তাত্ক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব নাও হতে পারে। যদি অভিযোগটি কোনো কারখানার নির্দিষ্ট অংশে মেশিন গার্ডের অভাব অথবা অতিরিক্ত ধুলো বা শব্দের মাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তবে মালিকের পক্ষে পরিস্থিতিটি অবিলম্বে সমাধান করা সম্ভব নাও হতে পারে। কোনো বিপদের অস্তিত্ব আছে কি না, বিপদের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির মাত্রা কতটুকু, এবং কীভাবে সেই ঝুঁকি কমানো যেতে পারে এসব বিষয়ে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে পরামর্শের জন্য মালিককে একজন নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তবুও এর মধ্যে সমস্যাটি থেকে যায়, এবং সংঘাতও থেকে যায়। ফলে কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট উত্তেজনা ক্রমে কর্মবিরতি বা অন্য কোনো ধরনের শিল্প-সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

১.৩ শ্রম বিরোধের সংজ্ঞা ও ধরনসমূহ

অনেক জাতীয় আইন বিভিন্ন ধরনের বিরোধের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে।

সবচেয়ে প্রচলিত দুটি শ্রেণিবিভাগ হলো:

- ব্যক্তিগত বনাম যৌথ বিরোধ
- অধিকারসংক্রান্ত বনাম স্বার্থসংক্রান্ত বিরোধ

কিছু বিরোধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির, অন্যগুলো যৌথ। কিছু বিরোধ অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ হিসেবে চিহ্নিত হয়। আবার অন্যগুলো স্বার্থ সংক্রান্ত বিরোধ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত বিরোধ হলো একজন শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বিরোধ। সাধারণত, ব্যক্তিগত বিরোধ বলতে একজন শ্রমিক এবং তাঁর মালিকের মধ্যে মতভেদকে বোঝায়, যা সাধারণত কোনো বিদ্যমান অধিকার বা পাওনা নিয়ে হয়ে থাকে। এর মধ্যে এমন পরিস্থিতিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যেখানে বেশ কয়েকজন শ্রমিক একই বিষয়ে মালিকের সাথে একমত নন। তবে প্রতিটি শ্রমিক এখানে একক ব্যক্তি হিসেবে বা আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে থাকেন।

একটি যৌথ বিরোধে একদল শ্রমিক বা তাঁদের প্রতিনিধি এবং এক বা একাধিক মালিকের মধ্যে হয়ে থাকে। সাধারণত, একদল শ্রমিক এবং একজন মালিক বা মালিকপক্ষের মধ্যে বিদ্যমান অধিকার কিংবা ভবিষ্যৎ স্বার্থ নিয়ে একমত হতে না পারাকেই যৌথ বিরোধ বলা হয়। তবে এক্ষেত্রে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা আবশ্যিক নয়। একদল শ্রমিক জড়িত এমন কোনো বিরোধকে প্রকৃত অর্থে যৌথ বিরোধ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে সেই দলের প্রতিটি সদস্যের একই ধরনের অভিযোগ বা দাবি থাকতে হবে। এখানে এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি যৌথ বিরোধে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পৃক্ততা প্রয়োজনীয় নয়।

অধিকারসংক্রান্ত বিরোধ হলো একজন শ্রমিক বা একাধিক শ্রমিক এবং তাঁদের মালিকের মধ্যে আইন, যৌথ চুক্তি, অথবা চাকরির চুক্তির অধীনে বিদ্যমান কোনো সুবিধা ('অধিকার') লঙ্ঘন সম্পর্কিত একটি মতবিরোধ। সাধারণত, অধিকারসংক্রান্ত বিরোধে শ্রম আইন, যৌথ চুক্তি, ব্যক্তিগত শ্রম সম্পর্কিত চুক্তি, অথবা প্রচলিত কোনো নিয়মে উল্লেখ থাকা বিদ্যমান অধিকারের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ সম্পর্কিত বিষয় জড়িত থাকে। এ ধরনের বিরোধ সাধারণত শ্রমিকদের এমন দাবির প্রেক্ষিতে তৈরি হয়, যেখানে তারা আইনত ইতিমধ্যে বিদ্যমান সুবিধাগুলো যেমন-মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার ভাতা, ছুটি এবং কর্মপরিবেশের মতো বিষয়ে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হয়নি। অর্থাৎ এমন কোনো বিষয়, যা আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি অধিকার। অধিকারসংক্রান্ত বিরোধ ব্যক্তিগত বা যৌথ উভয় ধরনেরই হতে পারে।

উদাহরণ:

একজন শ্রমিকের তাঁর মালিকের সঙ্গে প্রতি মাসে ৩০০ মার্কিন ডলার মজুরি পাওয়ার চুক্তি রয়েছে। মাস শেষে মালিক শ্রমিককে মজুরি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। শ্রমিক বকেয়া মজুরি দাবি করতে শ্রম অফিস বা শ্রম বিভাগে যান। এটি একটি অধিকারসংক্রান্ত বিরোধ, কারণ এটি তাঁর বিদ্যমান ব্যক্তিগত শ্রম চুক্তির অধীনে ৩০০ মার্কিন ডলার পাওয়ার শ্রমিকের অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কোন কোন সময় কিছু দেশে, যেখানে নতুন শ্রম আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করা হয়েছে, সেখানে শ্রমিক ও মালিক আইনের অধীনে তাঁদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত না থাকার ফলে বিদ্যমান অধিকারের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে পরবর্তীতে যৌথ বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ ভবিষ্যৎ অধিকারের দাবির সাথে সম্পর্কিত। সাধারণত, স্বার্থসংক্রান্ত বিরোধ হলো শ্রম সম্পর্কিত চুক্তির অধীনে ভবিষ্যৎ অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে শ্রমিক এবং তাঁদের মালিকদের মধ্যে মতভেদ। স্বার্থসংক্রান্ত বিরোধ সাধারণত যৌথ দরকষাকষিতে অচলাবস্থার ফলে সৃষ্টি হয়। বাস্তবে, অধিকাংশ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ মূলত দরকষাকষি প্রক্রিয়া ভেঙে পড়ার ফল। যেখানে পক্ষসমূহ ভবিষ্যতে প্রযোজ্য হবে এমন চাকুরির শর্তাবলীর বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। স্বার্থসংক্রান্ত বিরোধ সাধারণত যৌথ প্রকৃতির হয়।

উদাহরণ:

যৌথ চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় শ্রমিকরা ১২% মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ৭% বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়। আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকরা ধর্মঘটে যান। এটি একটি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিরোধ, কারণ এটি শ্রমিকদের এমন শর্ত বা সুবিধা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা তাঁরা বর্তমানে ভোগ করছেন না।

কখনো কখনো শ্রম বিরোধের আরও একটি শ্রেণিবিভাগ করা হয়:

- অসৎ শ্রম আচরণ সম্পর্কিত বিরোধ, এবং
- স্বীকৃতি-সংক্রান্ত বিরোধ

কিছু বিচারব্যবস্থায় বিভিন্ন বিশেষ ধরনের অধিকারসংক্রান্ত বিরোধ চিহ্নিত করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতি, দরকষাকষি একক (ইউনিট) নির্ধারণ, যৌথ চুক্তির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, এবং অন্যায় আচরণ ও বরখাস্ত-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

অসৎ শ্রম আচরণ সম্পর্কিত বিরোধ সৃষ্টি হয় যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার কারণে বা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করার চেষ্টা করে।

স্বীকৃতি-সংক্রান্ত বিরোধ সৃষ্টি হয় যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা কোনো মালিক সংগঠন যৌথ দরকষাকষির উদ্দেশ্যে কোনো ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

অধিকাংশ জাতীয় আইনের বিধি অনুসারে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিরোধের ধরনের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পদ্ধতিটি নির্ভর করে বিরোধটি “অধিকারসংক্রান্ত” না “স্বার্থ সংক্রান্ত”- তার উপর। তবে স্বীকৃতি-সংক্রান্ত বিরোধ বা অসৎ শ্রম আচরণ সম্পর্কিত বিরোধের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিছু দেশ কেবল বিরোধটি ব্যক্তিগত না যৌথ তার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিরোধ অধিকারসংক্রান্ত বিরোধ এবং অধিকাংশ যৌথ বিরোধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ, বাস্তবে এটি বড় কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না।

১.৪ শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তির গুরুত্ব

কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি সুস্থ শিল্প সম্পর্কের একটি ভিত্তিস্তর। এটি মালিক, শ্রমিক এবং তাঁদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির প্রধান উপায় হিসেবে কাজ করে। এটি মতভেদ নিষ্পত্তির জন্য একটি সুসংগঠিত ও সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া তৈরি করে, যা মতবিরোধকে আরও গুরুতর সংঘাতে রূপ নেওয়া থেকে রোধ করতে সহায়তা করে। শ্রমবিরোধ উৎপাদন ব্যাহত করতে, কর্মক্ষেত্রে মনোবল নষ্ট করতে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষতি করতে পারে।

শ্রম বিরোধ ব্যক্তিগত ও যৌথ উভয়ই কর্মপরিবেশের একটি অনিবার্য বিষয়। যদিও এটি সাধারণভাবে স্বীকৃত, তবুও ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয় যে, বিরোধ কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত নেতিবাচক পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধ অনুপস্থিতি বা উপস্থিতি থেকেও কাজে অনীহা, কাজে মনোযোগের অভাব, ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস, অসন্তুষ্টি ইত্যাদির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বিরোধ নিষ্পত্তির গুরুত্ব শ্রমবিধি দ্বারা স্বীকৃত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, শ্রমবিধিতে বিরোধ মোকাবিলার জন্য একটি পদ্ধতির বিধান থাকে। যার মাধ্যমে একটি সুসজ্জল উপায়ে বিরোধের একটি ফলাফল অর্জন করা যায়। কর্মক্ষেত্রে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে, সরকার সামাজিক অংশীজনদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে আইনি কাঠামোর ভেতরে এবং বাইরে সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে কার্যকরী বিরোধ নিরসন ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

একটি কার্যকর বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা হলো শ্রমবাজারের সুশাসনের একটি অন্যতম মূল উপাদান এবং ব্যক্তিগত ও যৌথ বিরোধের ক্ষেত্রে শ্রম ন্যায়বিচার পাওয়ার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার একটি প্রধান মাধ্যম। এ ধরনের ব্যবস্থা যদি সুপরিচালিত ও চলমান হয়, তবে তা প্রত্যেক শ্রমিক ও মালিককে এবং তাঁদের সংগঠনসমূহকে-তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিয়ে থাকে। সেইসাথে তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান শ্রম বিরোধসমূহ দ্রুত, ন্যায্যভাবে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করে থাকে।

১.৪.১ স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল কর্মপরিবেশ উন্নীতকরণ

একটি শক্তিশালী বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সরাসরি একটি স্থিতিশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ গঠনে অবদান রাখে। অভিযোগ ও মতবিরোধ মোকাবিলায় স্পষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে এটি অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা কমায় এবং সব পক্ষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করে। শ্রমিকরা যখন অনুভব করেন যে তাঁদের উদ্বেগ শোনা হবে এবং ন্যায্যভাবে বিবেচনা করা হবে, তখন তাঁদের কাজে আরও সম্পৃক্ত ও উৎপাদনশীল থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

এটি মালিকপক্ষের জন্য একটি স্থিতিশীল পরিবেশ ধর্মঘট ও লক-আউটের মতো বিশৃঙ্খলার ঝুঁকি কমিয়ে আনে। ফলে ব্যবসার ধারাবাহিকতা এবং পরিচালনাগত দক্ষতা নিশ্চিত হয়। এই স্থিতিশীলতা দক্ষ কর্মী আকর্ষণ ও ধরে রাখার এবং নতুন বিনিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম মূল চাবিকাঠি।

১.৪.২ বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং ন্যায্য ফলাফল নিশ্চিতকরণ

শ্রম বিরোধগুলো যদি সমাধান না করে ফেলে রাখা হয়, তবে তা খুব দ্রুতই ছোট-খাটো অভিযোগ থেকে বড় ধরনের মুখোমুখি সংঘাতে রূপ নিতে পারে। একটি কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়েই এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একটি সমরোপযোগী ও সহজলভ্য মাধ্যম প্রদান করে থাকে। পক্ষগুলোর অবস্থান কঠোর হওয়ার আগেই উত্তেজনা প্রশমিত করতে এবং পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার জন্য এই প্রাথমিক পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়াটি, তা মধ্যস্থতা বা সালিশি যে মাধ্যমেই হোক না কেন, নিরপেক্ষ থাকার জন্য এবং প্রতিষ্ঠিত আইনি কাঠামো ও ন্যায়বিচারের নীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে, ফলাফলগুলো কেবল বাস্তবসম্মতই নয়, বরং তা ন্যায়সঙ্গতও, যা এই ব্যবস্থার প্রতি দীর্ঘমেয়াদী আস্থা তৈরি করে।

১.৪.৩ আস্থা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি

একটি কাঠামোবদ্ধ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ স্বভাবতই পক্ষগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করে। এর জন্য পক্ষসমূহকে তাঁদের অবস্থান স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে, বিপরীত মতামত শুনতে এবং সমাধানের দিকে যৌথভাবে কাজ করতে হয়। এই প্রক্রিয়া সংঘাতের কারণে দুর্বল হয়ে পড়া আস্থা পুনর্গঠনে সহায়তা করতে পারে। একটি সফল সমঝোতা যেখানে উভয় পক্ষ অনুভব করে যে তাঁদের সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করা হয়েছে, তা কর্মক্ষেত্রে সংলাপ ও সহযোগিতার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে। এই বর্ধিত আস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায়শই নির্দিষ্ট কোনো বিরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার সামগ্রিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে।

১.৪.৪ আইন ও বিধিমালা নিশ্চিতকরণ এবং অধিকার সুরক্ষা

একটি কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা জাতীয় শ্রম আইন, যৌথ দরকষাকষি চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। এটি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ বর্ণিত মালিক ও শ্রমিক উভয়ের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা কার্যকর করার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। এসব বিধিবিধানের লঙ্ঘন আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করা এবং সংশোধনের একটি উপায় প্রদান করার মাধ্যমে এটি কর্মক্ষেত্রে আইনের শাসনকে সমর্থন করে এবং শ্রমিকদের শোষণ থেকে সুরক্ষা দেয়। আইএলও (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)-এর কাছে এটি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

১.৪.৫ কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার নির্দিষ্ট উপাদানসমূহ

কার্যকর বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কিছু নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে যা নিম্নরূপ:

- প্রতিরোধের উপর গুরুত্বারোপ
- সেবা ও কার্যক্রমের পরিসর ও বিনামূল্যে সেবা প্রদান

- স্বচ্ছামূলক অংশগ্রহণ
- অপ্রাতিষ্ঠানিক ও সহজতর প্রক্রিয়া
- উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ
- পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা
- স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা
- প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- ব্যবহারকারীদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন

১.৫ শ্রম অধিকার প্রাপ্তির মূলনীতিসমূহ

সামাজিক ন্যায়বিচার উন্নয়নে আইএলও -এর যে ম্যান্ডেট বা মূল লক্ষ্য রয়েছে, শ্রম অধিকার ও সুশাসন (অ্যাক্সেস টু লেবার জাস্টিস) নিশ্চিত করা তারই একটি অংশ। এটি শোভন কর্মপরিশেষের অগ্রগতি, সুশাসন জোরদার এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে লক্ষ্যমাত্রা ৫ (লিঙ্গ সমতা), ৮(শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি), ১০(অসমতা হ্রাস) এবং ১৬(শান্তি, ন্যায়বিচার ও টেকসই প্রতিষ্ঠান)। এটি শ্রম অধিকার বা সুশাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ও বস্তুগত উভয় ধরনের ন্যায়বিচারকে অন্তর্ভুক্ত করে। যা শ্রমিক ও মালিককে তাঁদের অধিকার পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে এবং তাঁদের স্বার্থের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে সক্ষম করে তোলে। শ্রম অধিকার বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানের কার্যকর প্রয়োগের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্কের জন্য এমন একটি কার্যকরী ও সহজলভ্য বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা অত্যন্ত অপরিহার্য। এটি যেকোনো সংঘাতকে সূষ্ঠ ও সমন্বিতভাবে সমাধান করতে পারে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রম অধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করা একটি অন্যতম অপরিহার্য ভিত্তিস্তর। ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার অর্ডার ১৬-এর ৩ নম্বর লক্ষ্য হলো “জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন উন্নীত করা এবং সবার জন্য সমানভাবে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা”।^১ লক্ষ্য ৬-এ রয়েছে “সর্ব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা,”^২ এবং ৭ নম্বর লক্ষ্যটি হলো “সর্ব স্তরে সাড়া-প্রদানক্ষম, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা”।^৩

কার্যকর শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গড়ে ওঠে না; এর জন্য যথাযথ প্রতিষ্ঠান, কাঠামো ও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। সহজলভ্যতার অভাব, স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, সীমিত সম্পদ, জটিল প্রক্রিয়াগত শর্তাবলি এবং অপরাধ প্রতিকারের মতো চ্যালেঞ্জগুলো এখনো বিশ্বজুড়ে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাগুলোকে বাধাগ্রস্ত করছে। তদুপরি, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এ ধরনের ব্যবস্থাগুলো যেন সামাজিক অংশীদারদের মধ্যে প্রকৃত সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছামূলক বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ তৈরি করে দেয়।

এই জটিল ও পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে, যেখানে কাজের নতুন ধরন এবং স্থায়ী বৈষম্যমূলক শ্রমিক ও মালিকদের অধিকারকে দুর্বল করার ঝুঁকি তৈরি করছে, সেখানে শ্রম অধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট ও নীতিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। শ্রম অধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত হওয়া একটি মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ম্যান্ডেটের অন্যতম কেন্দ্রীয় নীতি। আইএলও এটিকে কেবল অভিযোগ দায়ের করার সক্ষমতার চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে দেখে থাকে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলে যা সব শ্রমিক ও মালিকের জন্য অংশগ্রহণমূলক, কম ব্যয়বহুল, দ্রুত, সহজ এবং কার্যকর। এই ব্যবস্থার মূল নীতিসমূহ এমনভাবে নির্ধারিত, যাতে বিরোধ নিষ্পত্তির আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো সত্যিকার অর্থেই তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে।

১ জাতিসংঘ, টেকসই উন্নয়ন অর্ডারসমূহ, অর্ডার ১৬ – টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রসার করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

২ জাতিসংঘ, টেকসই উন্নয়ন অর্ডারসমূহ, অর্ডার ১৬, লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬ – সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৩ জাতিসংঘ, টেকসই উন্নয়ন অর্ডারসমূহ, অর্ডার ১৬, লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৭ – সব স্তরে সাড়া-প্রদানক্ষম, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

২. শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তির গুরুত্ব

“বিরোধ নিষ্পত্তি” শব্দটি কখনো কখনো কোনো বিরোধ শেষ করার সব ধরনের উপায় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিরোধ মীমাংসার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়। “নিষ্পত্তি” সাধারণত আলোচনা, সমঝোতা এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ সমাধানকে বোঝায়, যেখানে বিরোধী পক্ষসমূহ নিজেদের সমস্যা সমাধানের প্রধান দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে থাকে। “মীমাংসা” বলতে সালিশ এবং বিচারিক সিদ্ধান্তকে বোঝায়, যেখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ বিরোধটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসার জন্য একটি সিদ্ধান্ত আরোপ করে।

বিরোধ নিষ্পত্তিতে তিনটি ধারাবাহিক নীতি রয়েছে: যথা-

- প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম
- প্রতিরোধ অসম্ভব হলে, বিরোধী পক্ষসমূহের নিজেদেরই সমস্যাটি সমাধান করা উচিত
- বিরোধী পক্ষসমূহ নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে না পারলে, যেকোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে বিরোধী পক্ষসমূহকে যতটা সম্ভব সম্পৃক্ত রাখা উচিত

বিরোধ প্রতিরোধ করা যেতে পারে:

- কার্যকর কর্মক্ষেত্র সহযোগিতার মাধ্যমে
- কার্যকর শ্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে (পরিপালন বা আইন ও বিধিমালা নিশ্চিতকরণ ও পরামর্শমূলক ভূমিকা পালন)
- শ্রমিক ও মালিকদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে তথ্য প্রচারের মাধ্যমে

এটি অর্জন করা যেতে পারে:

- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে, উদাহরণস্বরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে
- গণমাধ্যমের দ্বারা, যেমন- রেডিও ও টেলিভিশন স্পট অথবা সংবাদপত্রে সাপ্তাহিক শ্রম কলাম
- লিফলেট (প্রচারপত্র) ও ব্রোশিওর (তথ্যপুস্তিকা) বিতরণের মাধ্যমে
- সচেতনতামূলক সমাবেশ ও সভার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষসমূহের নিজেদের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রধানত আলোচনা এবং যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। একবার কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো গেলে, তা পরবর্তী বিরোধ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।
- তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরোধী পক্ষসমূহ কর্তৃক কোনো মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে শুরু করা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ
- সমঝোতা ও মধ্যস্থতা
- সালিশ
- বিচারিক সিদ্ধান্ত

২.১ শ্রম পরিদর্শন ও বিরোধ প্রতিরোধ

শ্রম পরিদর্শকদের বিরোধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত অধিকারসংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে।^৪

শ্রম পরিদর্শকগণ:

- শ্রম আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান প্রয়োগ করেন
- আইন কীভাবে পরিপালন করতে হবে সে বিষয়ে মালিক ও শ্রমিকদের পরামর্শ দেন
- আইনের আওতায় নেই এমন সমস্যা ও ত্রুটিসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন

৪ ব্যক্তিগত শ্রম অধিকার-সংক্রান্ত অভিযোগও শ্রমিকরা সরাসরি শ্রম পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করতে পারেন।

শ্রম আইনের প্রয়োগ:

শ্রম পরিদর্শকরা নিম্নলিখিত বিষয়সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ করতে পারেন:

- মজুরি, কর্মঘণ্টা, ছুটি এবং অতিরিক্ত সময়ের মজুরিসহ কাজের শর্তাবলি
- শিশুশ্রম-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য^৫ এবং
- অন্যান্য সব বিষয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের বিধান শ্রম পরিদর্শকদের দ্বারা কার্যকর করা যায় এসব বিষয় শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাব্য উৎস এবং দ্রুত ও ন্যায্যভাবে মোকাবিলা করা না হলে শ্রম বিরোধে রূপ নিতে পারে।

নিয়মিত শ্রম পরিদর্শন শ্রম আইনের পরিপালন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সম্ভাব্য সমস্যাগুলোকে বিরোধে রূপ নেওয়ার আগেই চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। এ ধরনের পরিদর্শন সাধারণত পূর্বঘোষণা ছাড়াই করা হয়। পরিদর্শক দিনে বা রাতে যেকোনো সময়, কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই পরিদর্শনের আওতাধীন কর্মক্ষেত্রে যান।

উদাহরণ:

যদি শ্রমবিধিতে নির্ধারণ করা থাকে যে শ্রমিকদের প্রদেয় ন্যূনতম মজুরি প্রতি সপ্তাহে ৩০০ মার্কিন ডলার, এবং পরিদর্শনকালে পরিদর্শক যদি দেখতে পান যে মালিক প্রতি সপ্তাহে ২০০ মার্কিন ডলার প্রদান করছেন, তবে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্ভাব্য বিরোধ হতে পারে। পরিদর্শক আইন প্রয়োগ করে মালিককে প্রতি সপ্তাহে ৩০০ মার্কিন ডলার এবং যেকোনো বকেয়া পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে সমস্যাটি সমাধান করেন।

আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ ও পরামর্শ প্রদান:

শ্রম পরিদর্শকদের দায়িত্ব কেবল আইন প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তাঁদের মালিক ও শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করেন:

- আইনে কী বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা
- কোথায় আইনি শর্তাবলি পূরণ করা হয়নি তা নির্দেশ করা
- আইন পরিপালনের জন্য কী করা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করা

আইন কীভাবে পরিপালন করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে পরিদর্শকরা সমস্যা সৃষ্টি হওয়া প্রতিরোধ করতে পারেন।

আইনের অর্থ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পরিদর্শকদের হতে হবে:

- সঠিক
- নতুন নতুন তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল
- নিরপেক্ষ
- স্পষ্ট, সুসংগত এবং সুনির্দিষ্ট
- যুক্তিসঙ্গতভাবে সংগঠিত
- সামঞ্জস্যপূর্ণ

তথ্যটি যেন মালিক ও শ্রমিকের কাছে বোধগম্য হয় এবং এটি যেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরামর্শ দেওয়ার সময় পরিদর্শকদের কোনো কাজ কীভাবে করতে হবে তার কারিগরী খুঁটিনাটির পরিবর্তে, কী করা প্রয়োজন-তার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

^৫ কিছু দেশে, পৃথক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) পরিদর্শক রয়েছেন, যারা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিদর্শন পরিচালনা করেন।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

উদাহরণ:

একটি পরিদর্শনের সময় শ্রমিকরা অতিরিক্ত ধুলার মাত্রা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এটি শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা বা মালিকপক্ষের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাতের একটি উৎস নির্দেশ করে। পরিদর্শক দেখতে পান যে ধুলার মাত্রা প্রকৃতপক্ষে আইনে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি, এবং মালিককে একটি এক্সজস্ট সিস্টেম স্থাপনের পরামর্শ দেন। এর মাধ্যমে পরিদর্শক ধুলার মাত্রা-সম্পর্কিত আইন পরিপালনের জন্য মালিককে কী করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন এবং এমন একটি সংঘাত প্রতিরোধ করেছেন, যা বিরোধে রূপ নিতে পারত। তবে এক্সজস্ট সিস্টেমের নকশা প্রণয়ন এবং তার স্থাপন তদারকি করা পরিদর্শকের কাজ নয়।

আইনের আওতায় নেই এমন সমস্যা:

পরিদর্শন চলাকালীন পরিদর্শকরা এমন সমস্যা পেতে পারেন, যা আইনের আওতায় নেই। এ ধরনের সমস্যা সংঘাতের উৎস হতে পারে এবং শ্রম বিরোধে রূপ নিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে পরিদর্শকের উচিত:

- সমস্যাটি শনাক্ত করা
- লিখিতভাবে তার বিবরণ প্রদান করা
- যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তা প্রতিবেদন করা

পরিদর্শকদের উচিত মালিককে পরিস্থিতি সংশোধনের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া এবং আইনগত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার কাঠামোর মধ্যে থেকে নিয়ম মেনে চলার জন্য বিকল্প উপায় প্রদান করা। এই পরামর্শ লিখিতভাবে নথিভুক্ত করা উচিত। যদি বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আইনি বিধানের আওতায় না পড়ে, তবে পরিদর্শকের উচিত আইনগত প্রয়োজনীয়তা এবং উল্লেখিত যেকোনো মানদণ্ড বা কারিগরি নিয়মের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা। এরপর বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন করা হয়।

এভাবে প্রতিবেদনকৃত ত্রুটি ও সমস্যাসমূহ আইন সংশোধনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিরোধ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। তবে আইন সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত পরিদর্শককে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অন্যান্য পন্থার উপর নির্ভর করতে হবে। যেমন- পরামর্শ, আলোচনা ও দরকষাকষি উৎসাহিত করা। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে: এসব পদ্ধতি পরিদর্শক ও মালিকদের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্কে উৎসাহিত করে। সেইসাথে এটি সংঘাতহীন পন্থার প্রতি আস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। নিয়ম মেনে চলতে উৎসাহিত করে এবং আইনগত প্রয়োগের প্রয়োজন ছাড়াই ইতিবাচক ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

২.২ কর্মক্ষেত্রে শ্রম বিরোধের প্রভাব

শ্রম বিরোধ যদি কার্যকরভাবে প্রতিরোধ বা নিষ্পত্তি করা না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য তা উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এসব প্রভাব তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি উভয়ই হতে পারে, যা ব্যবসার আর্থিক সক্ষমতা এবং শ্রমিকদের কল্যাণকে প্রভাবিত করে।

শ্রমিকদের জন্য:

অনিষ্পন্ন বিরোধের ফলে আয় কমে যাওয়া, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং গুরুতর মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। এই মানসিক প্রভাব তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন এবং সামগ্রিক মনোবলকে প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সম্পৃক্ততা ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেতে পারে।

মালিকদের জন্য:

বিরোধের ফলে আইনগত পরিপালন ব্যয় এবং প্রশাসনিক চাপের কারণে পরিচালনাগত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এগুলো কোম্পানির সুনামও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যার ফলে দক্ষ জনবলকে আকর্ষণ করা ও ধরে রাখা এবং বিনিয়োগ ও অংশীদার আকর্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংঘাতের উপর বেশি মনোযোগ দেওয়ার কারণে মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে মনোযোগ সরে যায় এবং উৎপাদনশীলতা প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ট্রেড ইউনিয়নের জন্য:

বিরোধ দ্বিমুখী প্রভাব ফেলতে পারে এবং তা মোকাবিলা করা একটি জটিল চ্যালেঞ্জ। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় শিল্প-সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার ও অপরিহার্য হাতিয়ার। তবে কোনো বিরোধ দুর্বলভাবে পরিচালিত হলে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তা ইউনিয়নের অবস্থানকে দুর্বল করতে পারে। কোনো ব্যর্থ বা দীর্ঘায়িত বিরোধ বিশেষ করে যে বিরোধে শ্রমিকদের জন্য সামান্য বা কোনো অর্জনই হয় না তা ইউনিয়নের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং সদস্যসংখ্যা হ্রাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে, সদস্যরা ইউনিয়নের কার্যকারিতা ও নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন।

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের জন্য:

অনিষ্পন্ন বিরোধের চলমান পরিস্থিতি শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যকার আস্থা কমিয়ে দেয়। এটি সম্পর্ক ভেঙে পড়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে এমন একটি অনুৎপাদনশীল পরিবেশ তৈরি হয়, যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সংলাপের কার্যকারিতা ব্যাহত করে।

শিল্প ব্যবস্থা:

বিরোধ শিল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। এটি হলো বিরোধী পক্ষগুলোর কোনো এক পক্ষ কর্তৃক নিজের স্বার্থ উন্নীত বা সুরক্ষিত করার জন্য গৃহীত যেকোনো ধরনের পদক্ষেপ। শিল্প ব্যবস্থা সাধারণত উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। শিল্প ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রচলিত ধরনসমূহ হলো:

- **নিষেধাজ্ঞা:** কোনো একজন শ্রমিক বা শ্রমিকদের একটি দলের নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করতে, নির্দিষ্ট সরঞ্জাম ব্যবহার করতে অথবা অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করতে অস্বীকৃতি।
- **টিমেতালে কাজ:** কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করার পরিবর্তে কর্মপ্রচেষ্টা বা উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া। এটি “নিয়মানুযায়ী কাজ” কর্মপদ্ধতি অনুসরণের ফলও হতে পার। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকরা প্রতিটি নিয়ম ও প্রক্রিয়া কঠোরভাবে অনুসরণ করেন, ফলে কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়ে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেতে পার।
- **শিল্পে নাশকতা:** কোনো শ্রমিক বা শ্রমিকদের একটি দল কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য বা সেবা নষ্ট বা ব্যাহত করার মাধ্যমে, অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সম্পত্তি বা যন্ত্রপাতির ক্ষতি করার মাধ্যমে মালিকপক্ষের আয়ের ক্ষতি করা।
- **লক-আউট (কারখানা বা প্রতিষ্ঠান অবরুদ্ধ করা):** মালিকপক্ষ কর্তৃক কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া। লক-আউট চলাকালে শ্রমিকরা কোনো মজুরি পাওয়ার অধিকারী নন, কারণ এই সময়ে কোনো কাজ সম্পাদন করা যায় না।
- **ধর্মঘট:** শ্রমিকদের একটি দল কর্তৃক সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ করা বা কাজ থেকে বিরত থাকা। ধর্মঘটকারীরা নিজেদের শ্রমিক হিসেবেই বিবেচনা করেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি হলে তাঁদের কাজে ফিরে যাওয়ার অধিকার রয়েছে বলে মনে করেন। ধর্মঘট পিকেটিংয়ের মাধ্যমে সমর্থিত হতে পারে। এতে ধর্মঘটে থাকা শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রের আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন বা হাঁটাহাঁটি করেন।

শিল্প সংক্রান্ত কাজের মধ্য রয়েছে:

- প্রকাশ্য, যেমন ধর্মঘট ও পিকেটিং, অথবা লক-আউট
- গোপন, যেমন- নাশকতা
- সংগঠিত বিরোধ
- যৌথ বিরোধ

অসন্তোষ প্রকাশের অন্যান্য, কম আনুষ্ঠানিক উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে:

- শ্রমিক পরিবর্তনের হার বৃদ্ধি
- অনুপস্থিতি
- দেরিতে উপস্থিতি

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

একটি শিল্প সংঘাত তখনই বিরোধে পরিণত হয় যখন তা কোনোভাবে আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- শিল্প ব্যবস্থা
- কোনো এক পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ দাখিল
- এক বা উভয় পক্ষ কর্তৃক সংঘাত নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন-আলোচনা বা কোনো সমঝোতাকারীর হস্তক্ষেপ চাওয়া

আস্থা ও সামাজিক সংলাপের ঘটতি:

বিরোধ পারস্পরিক আস্থার ঘটতি সৃষ্টি করতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আস্থার ভিত্তি দুর্বল করে দিতে পারে। পারস্পরিক আস্থা একটি উৎপাদনশীল কর্মপরিবেশের জন্য অপরিহার্য। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ‘সংঘাত ও নিয়ন্ত্রণ’-কেন্দ্রিক মানসিকতা থেকে ‘আস্থা ও সহযোগিতা’-কেন্দ্রিক মানসিকতায় অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উৎপাদনশীলতা হ্রাস ও অর্থনৈতিক ব্যয়:

অনিষ্পন্ন বিরোধ প্রকাশ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন -ধর্মঘট ও লক-আউট, অথবা আরও সূক্ষ্ম সমস্যা, যেমন-অনুপস্থিতি বৃদ্ধি, দেরিতে উপস্থিতি এবং নিম্ন মনোবল-এর মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। এসব বিষয় সরাসরি উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে এবং আইনগত পরিপালন ব্যয়, উৎপাদন ক্ষতি ও সুনামহানির কারণে মালিকপক্ষের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ব্যয়ের কারণ হতে পারে।

এসব নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, শ্রমক্ষেত্রে ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির নীতিসমূহ কেন অপরিহার্য। এগুলো সংঘাত প্রশমন, সমন্বয়যোগীভাবে নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ এবং একটি স্থিতিশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ উন্নীত করাকে গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে আইএলও-এর অবস্থান হলো, কার্যকর বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা কেবল আইন প্রয়োগের বিষয় নয়; বরং এটি সৌহার্দ্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং শোভন কর্মপরিবেশ উন্নীত করার বিষয়।

২.৩ সংঘাতের প্রতি সাধারণ প্রতিক্রিয়া সাধারণত, সংঘাত নিষ্পত্তির চারটি পন্থা রয়েছে, যথা:

- এড়িয়ে যাওয়া, যেখানে কোনো পক্ষ কেবল বিরোধ মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়;
- ক্ষমতা প্রয়োগ, যেখানে কোনো পক্ষ অন্য পক্ষকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করার জন্য জবরদস্তি করে;
- অধিকারভিত্তিক পন্থা, যেখানে কোনো পক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অধিকার বা ন্যায্যতার কোনো স্বাধীন মানদণ্ড ব্যবহার করে;
- ঐকমত্যভিত্তিক পন্থা, যেখানে কোনো পক্ষ তাদের অবস্থানসমূহ বা অন্তর্নিহিত প্রয়োজনসমূহ সমন্বয়, আপস বা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

প্রায়ই বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন পন্থাগুলো উপরের ক্রম অনুসরণ করে। তবে আদর্শগত ভাবে পন্থাটি বিপরীত ক্রমে হওয়া উচিত প্রথমে ঐকমত্য, তার উপর অধিকার, এরপর ক্ষমতা প্রয়োগ। আর এড়িয়ে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া উচিত।



একটি কার্যকর ব্যবস্থায় পিরামিডের ওপরের দিকে অগ্রসর হলে আদর্শ ক্রম হবে: ঐকমত্য, অধিকার, ক্ষমতা।

একটি কার্যকর ব্যবস্থা ঐকমত্যভিত্তিক প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু হয় এবং এগুলোকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। এরপর অধিকারভিত্তিক প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। ক্ষমতা কেবল তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন অন্য কোনো সমাধান পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে:

- এই ক্রমে বিরোধের ফলাফলের উপর পক্ষসমূহের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা কমে যায়;
- এই ক্রমে ফলাফল নিয়ে পক্ষসমূহের সন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়;
- এই ক্রমে বিরোধের প্রকৃত কারণসমূহ মোকাবিলার মাত্রা কমে যায়;
- এই ক্রমে পক্ষসমূহের ফলাফল মেনে চলার সম্ভাবনা কমে যায়;
- এই ক্রমে পক্ষসমূহের প্রকৃত প্রয়োজনসমূহ মোকাবিলার মাত্রা কমে যায়;
- এই ক্রমে পক্ষসমূহের বিচ্ছিন্নতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়;
- এই ক্রমে পক্ষসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়;
- এই ক্রম অনুসরণ করলে সংশ্লিষ্ট সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।



[CON/ARB বলতে বাধ্যতামূলক মীমাংসা/সালিশ বোঝায়]

২.৪ শ্রম বিরোধ প্রতিরোধের গুরুত্ব

মালিক, শ্রমিক ও তাঁদের প্রতিনিধিদের মধ্যে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে এ ধরনের বিরোধ প্রতিরোধের প্রধান তিনটি পদ্ধতি হলো যৌথ দর-কষাকষি, কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি।

২.৪.১ যৌথ দরকষাকষি

যৌথ দর-কষাকষিতে এক বা একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং এক বা একাধিক মালিক বা মালিক সংগঠন দুইটি প্রধান বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য আলোচনা করে। প্রথমটি হলো কর্মসংস্থানের শর্ত ও সুবিধাদি। দ্বিতীয়টি হলো কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয় কীভাবে উভয় পক্ষ যৌথভাবে মোকাবিলা করবে এবং তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা কীভাবে নিষ্পত্তি করা হবে সে বিষয়ে প্রযোজ্য নিয়মাবলি। আলোচনা বা দর-কষাকষি হলো যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি মাধ্যম।

শ্রম বিরোধ অভ্যন্তরীণভাবে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যৌথ দর-কষাকষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি আলোচনা ও সমঝোতার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক ও পূর্বনির্ধারিত কাঠামো প্রদান করে। ফলে ধর্মঘট বা আইনি পদক্ষেপের মতো পদ্ধতিতে না গিয়ে শ্রমিক ও মালিকপক্ষ একটি সুস্জ্ঞান ও সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে:

একটি যৌথ দরকষাকষি চুক্তি (Collective Bargaining Agreement-CBA) আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি, যাতে সাধারণত একটি স্পষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি বিদ্যমান থাকে। এর অর্থ হলো, যখন কোনো মতভেদ সৃষ্টি হয় তা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, কর্মসূচি পরিবর্তন, অথবা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ যাই হোক না কেন উভয় পক্ষই তা নিষ্পত্তির জন্য ঠিক কোন ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে তা জানে। এই কাঠামো বিরোধকে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব পরিণত হওয়া থেকে রোধ করে।

পারস্পরিক যোগাযোগ ও আস্থা বাড়ায়: যৌথ দরকষাকষির চলমান প্রক্রিয়া, যা চুক্তি আলোচনার থেকেও বিস্তৃত। এটি ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগকে উৎসাহিত করে। এই ধারাবাহিক সংলাপ পারস্পরিক সম্মান ও আস্থার ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ফলে সমস্যা তীব্রতর হওয়ার আগেই সহযোগিতামূলকভাবে সমাধান করা সহজ হয়।

শ্রমিকদের মতামত ও দাবি তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি করে: ইউনিয়নের মাধ্যমে যৌথ দরকষাকষি শ্রমিকদের মতামত ও দাবি তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি নিশ্চিত করতে পারলে শ্রমিকরা আলোচনার টেবিলে সমান প্রতিনিধিত্ব পান, ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে এবং তাঁদের উদ্বেগ শোনা হয় ও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দেয়: যৌথ দর-কষাকষি শুধু বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পর তা নিষ্পত্তির একটি উপায় নয়; বরং বিরোধ প্রতিরোধেরও একটি কার্যকর মাধ্যম। কর্মসংস্থানের শর্তাবলি নিয়মিত আলোচনা ও হালনাগাদ করার মাধ্যমে উভয় পক্ষ নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন এবং পরিবর্তনশীল কর্মক্ষেত্রের মানদণ্ডের মতো সম্ভাব্য সংঘাতের কারণগুলো আগেই চিহ্নিত ও মোকাবিলা করতে পারে। এই প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) যৌথ দরকষাকষিকে একটি মৌলিক অধিকার এবং কার্যকর সামাজিক সংলাপের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে বিবেচনা করে। যৌথ দরকষাকষি শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর একটি কার্যকর উপায়। এর ফলে সরকার বা আদালতের মতো বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। মূলত, কর্মক্ষেত্রের নিয়মাবলির উপর যৌথ মালিকানার একটি ব্যবস্থা তৈরি করার মাধ্যমে এটি শিল্প শান্তি এবং শোভন কাজ বা কর্মপরিবেশ উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়।

২.৪.২ কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা

কার্যকর কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা ব্যবস্থা থেকে অর্জনযোগ্য উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলোর স্বীকৃতিস্বরূপ, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পরামর্শ ও সহযোগিতা বিষয়ক আইএলও সুপারিশ নং ৯৪ (১৯৫২), রাষ্ট্রসমূহকে কর্মক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহযোগিতা উন্নীত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করে থাকে। সুপারিশ নং ৯৪-এ বলা হয়েছে যে, পক্ষগুলোর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এবং পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো যেতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা একটি স্বেচ্ছামূলক প্রক্রিয়া। যদিও পারস্পরিক যোগাযোগের কিছু ফোরাম আইনের দ্বারা আবশ্যিক হতে পারে। যেমন-কর্ম পরিষদ, যৌথ পরামর্শমূলক সংস্থা অথবা অন্যান্য শ্রমিক-ব্যবস্থাপক কমিটি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা। আইন এ ধরনের সংস্থা গঠনের নির্দেশ দিলেও, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা সফলভাবে কার্যকর করতে হলে উভয় পক্ষেরই একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী থাকতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতাকে যৌথ দরকষাকষির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। যৌথ দরকষাকষি হলো কর্মসংস্থানের শর্তাবলি নির্ধারণের একটি আলোচনা প্রক্রিয়া।

শ্রম বিরোধ অভ্যন্তরীণভাবে নিষ্পত্তির জন্য কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি সংঘাতের প্রতি একটি প্রতিরোধমূলক, গঠনমূলক এবং সম্পর্কভিত্তিক পছন্দ গড়ে তোলে। সমস্যাগুলো আনুষ্ঠানিক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংঘাতে রূপ নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, এটি প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়গুলো মোকাবিলা করা এবং পারস্পরিকভাবে যথাপোযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার একটি কাঠামো প্রদান করে থাকে।

সক্রিয়ভাবে বিরোধ প্রতিরোধ: এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো, সহযোগিতা গুরুত্বেই বিরোধ সৃষ্টি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে উন্মুক্ত যোগাযোগের মাধ্যম, নিয়মিত পরামর্শ এবং আস্থার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছোটখাটো সমস্যা ও ভুল বোঝাবুঝি তীব্রতর হওয়ার আগেই মোকাবিলা করা যায়।

কার্যকর ও সাশ্রয়ী নিষ্পত্তি: যখন কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়, তখন একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ দ্রুততর ও আরও কার্যকরভাবে অভ্যন্তরীণ নিষ্পত্তির সুযোগ করে দেয়। সালিশি বা আদালতীয় কার্যধারার মতো ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ বাহ্যিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছাড়াই আনুষ্ঠানিক যৌথ পরামর্শ কমিটির মতো প্রক্রিয়া ব্যবহার করে কর্মক্ষেত্রে পর্যায়েই সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়।

কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক সংরক্ষণ: প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আইনগত লড়াই প্রায়ই সম্পর্ককে অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ‘বিজয়ী সবকিছু পায়’ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি করে।

পক্ষান্তরে, সহযোগিতামূলক পদ্ধতি যৌথভাবে সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব দেয়। এটি উভয় পক্ষকে একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি শুনতে, অন্তর্নিহিত স্বার্থসমূহ বুঝতে এবং একটি সমাধান খুঁজে বের করতে একসঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করে। এই প্রক্রিয়া কেবল তাৎক্ষণিক বিরোধই নিষ্পত্তি করে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য পারস্পরিক সম্মান ও আস্থাকেও শক্তিশালী করে।

উন্নত ও অধিক টেকসই ফলাফল সহযোগিতামূলক নিষ্পত্তি আরও স্থায়ী ও সৃজনশীল সমাধানের দিকে নিয়ে যায়। কারণ, এতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সরাসরি ফলাফল নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। কোনো তৃতীয় পক্ষ সিদ্ধান্ত আরোপ করার পরিবর্তে, উভয় পক্ষ এমন একটি সমাধানে সম্মত হয় যা তাঁদের নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণ করে। এটি পরিপালনের সম্ভাবনা বাড়ায় এবং পরবর্তীতে বিরোধটি পুনরায় দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

২.৪.৩ অভিযোগ পদ্ধতি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

শ্রমিকদের এমন অধিকার ও প্রাপ্যতা রয়েছে, যা আইন, কর্মসংস্থান চুক্তি, যৌথ চুক্তি এবং কর্মক্ষেত্রের নিয়মাবলির পাশাপাশি প্রচলিত রীতি ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, শ্রমিকদের অভিযোগ থাকে যখন তাঁরা মনে করেন যে এসবের কোনো একটি দিক তাঁদের মালিক সম্মান করছেন না। অভিযোগ মূলত বিদ্যমান অধিকার ও প্রাপ্য সুবিধাগুলোর লঙ্ঘনের প্রতিকার করার সাথে সম্পর্কিত। যেমন- হয়রানি বা মানসিক হেনস্থা থেকে শুরু করে মজুরি কম প্রদান, বিশ্রামকাল, সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন বা সরকারি ছুটি দিতে অস্বীকৃতি, বৈষম্য, অথবা বোনাস বা অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাসমূহ কম প্রদান করা।

অনুরূপভাবে, কর্মক্ষেত্রে অভিযোগ বলতে মালিক, ব্যবস্থাপনা বা সহকর্মীদের প্রতি শ্রমিকদের অসন্তোষকে বোঝায়। আইএলও সুপারিশ নং ১৩০, অভিযোগকে এমন একটি পরিস্থিতি বা পদক্ষেপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, যা কোনো শ্রমিক বা শ্রমিকদের অবস্থাকে প্রভাবিত করে, অথবা প্রভাবিত করতে পারে। যেখানে ওই পরিস্থিতি বা পদক্ষেপটিকে প্রযোজ্য কোনো যৌথ চুক্তি, শ্রমিকর কর্মসংস্থান চুক্তি, কর্মক্ষেত্রের নিয়ম বা নীতিমালা, বিধিবিধান, আইন এবং শ্রমিকর পেশা বা দেশের রীতি অনুশীলনের পরিপন্থী হিসেবে দেখা যেতে পারে।

অভিযোগ অধিকারভিত্তিক বিরোধ এবং এটি ‘ব্যক্তিগত’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হতে পারে, যেখানে একজন শ্রমিক জড়িত থাকে; অথবা ‘যৌথ’ (সমষ্টিগত) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হতে পারে, যেখানে একই বিষয়ে শ্রমিকদের একটি দল অসন্তুষ্ট থাকে। শ্রমিকদের অভিযোগ ন্যায্য ও দক্ষতার সঙ্গে গঠনমূলকভাবে পরিচালনা ও নিষ্পত্তির জন্য কর্মক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অভিযোগের পরিসর বিস্তৃত, যদি তা প্রতিষ্ঠিত অধিকার ও প্রাপ্য সুবিধার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- হয়রানি ও মানসিক হেনস্থা;
- বৈষম্য;
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল/বিধি পালনে ব্যর্থতা;
- সুবিধাদি প্রদানে ব্যর্থতা বা অপরিপূর্ণ অর্থ প্রদান; এবং
- মালিক কর্তৃক বিশ্রামের দিন মঞ্জুর করতে অস্বীকৃতি।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

উদাহরণ:

একজন শ্রমিক মনে করেন যে তাঁর ব্যবস্থাপক তাঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন, কারণ তিনি ওই ব্যবসায় কর্মরত একমাত্র নারী এবং একজন মা। কয়েকটি ক্ষেত্রে, শ্রমিক তাঁর শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে কাজ করার অনুরোধ করেছেন। শ্রমিক শুনেছেন যে ব্যবস্থাপক তাঁর কাজের সমালোচনা করেছেন এবং সহকর্মীদের সামনে তাঁকে ‘অলস’ বলেছেন। শ্রমিকটি তাঁর ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ দায়ের করার জন্য মানবসম্পদ বিভাগে যোগাযোগ করেন।

অভিযোগ পদ্ধতি কোম্পানির পদ্ধতি, যৌথ চুক্তি এবং জাতীয় আইনের ভিত্তিতে তৈরি করা যেতে পারে। অভিযোগ পদ্ধতি কোম্পানির পদ্ধতিতে উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক শ্রমিকের কোনো ধরনের প্রতিকূলতার শিকার না হয়ে অভিযোগ দাখিল করার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে। তবে অভিযোগসমূহ যাতে ধারাবাহিক, ন্যায্য এবং দক্ষভাবে নিষ্পত্তি করা যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে একটি অভিযোগ পদ্ধতি ও নীতি-সংক্রান্ত নথিতে এই অভিযোগ পদ্ধতিগুলোকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়াই সর্বোত্তম। সুপারিশ নং ১৩০ সুপারিশ করে যে অভিযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনসমূহ বা তাদের প্রতিনিধিদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব দিয়ে সম্পৃক্ত করা উচিত।

অভিযোগ পদ্ধতির লক্ষ্য হলো:

- কর্মক্ষেত্রে সৌহার্দ্য ও স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা;
- শ্রমিকদের উদ্বেগ প্রকাশের জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা তা বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে হোক বা ধারণার ভিত্তিতে হোক;
- কর্মক্ষেত্রে বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা; এবং
- বাহ্যিক সংঘাত কমানো।

অভিযোগ পদ্ধতি পারস্পরিক স্বার্থের বিষয় বা যৌথ দরকষাকষির জন্য সংরক্ষিত বিষয় মোকাবিলার জন্য প্রণীত নয়।

উদাহরণ:

একটি যৌথ চুক্তি অনুযায়ী, একজন মালিক তাঁর শ্রমিকদের মজুরি হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত হন, কিন্তু তা করতে ব্যর্থ হন। এটি একটি অভিযোগ হিসেবে গণ্য হয়। তবে, যদি শ্রমিকরা তাঁদের মজুরি নিয়ে অসন্তুষ্ট হন এবং ১০% বৃদ্ধির দাবি করেন, আর মালিক তাঁদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে এটি অভিযোগ হিসেবে গণ্য হয় না। কারণ অভিযোগটি কোনো বিদ্যমান আইন, যেমন-যৌথ চুক্তি বা কর্মসংস্থান চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়।

পরামর্শ:

- অভিযোগ হলো কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষের অনুভূতি, যা কোনো অধিকার লঙ্ঘনের উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।
- অভিযোগ পদ্ধতি হলো অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া।
- অভিযোগ প্রক্রিয়া ন্যায্য ও দক্ষভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং তা কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীল করতে ও সংঘাত কমাতে সহায়তা করবে।
- অভিযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করার কারণে কোনো শ্রমিকের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

অভিযোগ নিষ্পত্তির নীতিসমূহ:

অভিযোগ পদ্ধতি এমনভাবে প্রণীত হয়, যাতে কোনো শ্রমিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বা তার ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সংঘাত কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়। অভিযোগ পদ্ধতি ধাপে ধাপে অগ্রসরমান পদ্ধতিতে প্রণীত হতে হবে, যাতে বিরোধ সম্পর্কে বোঝাপড়া তৈরি করা যায় এবং ঐকমত্যভিত্তিক নিষ্পত্তির সুযোগ অনুসন্ধান করা যায়।

অভিযোগ পদ্ধতি মালিক কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে এবং এমনভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে, যা আইনসম্মত, ন্যায্য, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, পূর্বানুমানযোগ্য এবং শ্রমিকদের জন্য অংশগ্রহণযোগ্য অভিযোগ দায়েরকারী শ্রমিকদেরকে কোনো ধরনের প্রতিকূলতার/হয়রানি বা বৈষম্যের শিকার করা যাবে না। একটি কার্যকর অভিযোগ পদ্ধতির লক্ষ্য হলো টেকসই ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্রে বজায় রাখা এবং বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা।

অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত ন্যায্যতা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে:

১. অভিযোগ পদ্ধতি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে। প্রতিটি ধাপের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণ করার সুপারিশ করা হয়।
২. পদ্ধতিগুলো সহজ হতে হবে এবং শ্রমিকদের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে;
৩. অভিযোগকারী ব্যক্তির অভিযোগ প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকা এবং অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, কারণ এটি জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ পরিবেশ সৃষ্টি করবে;
৪. কোনো নিষ্পত্তি, সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অভিযোগকারী এবং অভিযোগের বিষয়বস্তুতে উল্লিখিত যেকোনো শ্রমিক বা ব্যবস্থাপকের বক্তব্য শোনার অধিকার রয়েছে;
৫. অভিযোগ পরিচালনা বা সভাপতিত্ব করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই তা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে করতে হবে;
৬. শ্রমিকরা তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন থেকে প্রতিনিধিত্ব বা সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন এবং মালিকরা মালিক সংগঠন থেকে সহায়তা চাইতে পারেন;
৭. অভিযোগ প্রক্রিয়া পরিচালনার পূর্ববর্তী সময় এবং পরিচালনাকালীন সময়ে শ্রমিকদের উপার্জন কেড়ে নেওয়া বা কমানো যাবে না;
৮. সংশ্লিষ্ট অভিযোগ দায়ের করার কারণে শ্রমিকদের কোনো ধরনের শ্রমিকর সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না; এবং
৯. ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ বিভাগকে নিশ্চিত করতে হবে যে অভিযোগটি গোপনীয় থাকে যাতে অভিযোগকারী এবং অভিযোগে চিহ্নিত ব্যক্তিদের অবস্থান ক্ষুণ্ণ হয়।

সাধারণ অভিযোগ পদ্ধতি অগ্রসরমান বা ধাপে ধাপে পরিচালিত প্রক্রিয়া হিসেবে প্রণীত হয়। এটি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান ভেদে ভিন্ন হতে পারে। তবে নিম্নলিখিত ধাপগুলো সাধারণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়:

ধাপ ১: শ্রমিক অভিযোগটি একজন মনোনীত ব্যবস্থাপক বা মানবসম্পদ বিভাগের কাছে উত্থাপন করেন;

ধাপ ২: অভিযোগকারী শ্রমিকর লাইন ম্যানেজার অভিযোগের বিষয়বস্তু না হলে, অভিযোগ সম্পর্কে বোঝাপড়ার জন্য অভিযোগকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন;

ধাপ ৩: লাইন ম্যানেজার ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষসমূহের মধ্যে একটি ঐকমত্যভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। এটি সম্ভব না হলে, লাইন ম্যানেজার বাস্তব তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধান ও সুপারিশ প্রদান করবেন;

ধাপ ৪: অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট থাকলে, বিষয়টি প্রমাণ শুনানি এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য একজন উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক বা স্বাধীন সভাপতির কাছে পাঠানো হবে;

ধাপ ৫: অভিযোগকারী ফলাফল অথবা অনুসৃত কার্যপ্রণালিতে অসন্তুষ্ট হলে, তিনি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রযোজ্য প্রক্রিয়ায় বিষয়টি উপস্থাপন করতে পারেন।

অনেক সময় বিচার-বিবেচনায় সরল ভুল বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে অভিযোগ সৃষ্টি হয়। তাই পক্ষসমূহের মধ্যে সংলাপ ও বোঝাপড়ার সুযোগ করে দিলে তাঁরা একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে পারে এবং আরও আনুষ্ঠানিক ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া এড়াতে পারে।

কোম্পানিগুলোকে অবশ্যই লোক দেখানো সম্পর্কের উর্ধ্বে উঠে অভিযোগ নিষ্পত্তির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কারণ অভিযোগ পদ্ধতির ব্যর্থতা নেতিবাচক ও অনুৎপাদনশীল কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করবে। অভিযোগ পদ্ধতি প্রয়োগে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ব্যবস্থাপনা পক্ষসমূহকে নিষ্পত্তি খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য সৃজনশীল পন্থা ব্যবহার করতে পারে। যেখানে অভিযোগ প্রক্রিয়ার সভাপতিত্বকারী কোনো ব্যবস্থাপক বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ থাকতে অক্ষম হন, সেখানে বিষয়টি প্রকাশ করা এবং বিকল্প সভাপতি নিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ।

অভিযোগ পদ্ধতির চূড়ান্ত ফলাফল অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও সমাধানে বাস্তবসম্মত হতে হবে। অভিযোগের ফলাফলে শ্রমিকদের অসদাচরণ বা দুর্বল কর্মসম্পাদনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। তবে এটি নির্ধারণ করতে পারে যে, শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো শ্রমিকর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ভিত্তি রয়েছে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

উদাহরণ:

কোনো কোম্পানির অভিযোগ পদ্ধতিতে বলা আছে, “অভিযোগ অবশ্যই লাইন ম্যানেজারের কাছে দায়ের করতে হবে।” শ্রমিকের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, তিনি লাইন ম্যানেজারের বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করতে চাইতে পারেন। লাইন ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে শ্রমিক আরও বৈষম্য বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে, কোম্পানিগুলোকে কিছুটা নমনীয়তা প্রয়োগ করতে এবং শ্রমিককে মানবসম্পদ বিভাগের কাছে যাওয়ার সুযোগ দিতে উৎসাহিত করা হয়। অভিযোগ পদ্ধতির প্রথম ধাপে লাইন ম্যানেজারের চেয়ে উর্ধ্বতন একজন ব্যবস্থাপক সভাপতিত্ব করবেন।

পরামর্শ:

- অভিযোগ পদ্ধতি শ্রমিকদের উত্থাপিত বিষয়গুলো গঠনমূলকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রণীত।
- অভিযোগ পদ্ধতি লিখিত হতে হবে এবং সবার কাছে বোধগম্য হতে হবে।
- মালিককে অবশ্যই অভিযোগ পদ্ধতি ন্যায্যভাবে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হবে।
- অভিযোগ পদ্ধতি কোনো শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতি/শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়।
- অভিযোগ পদ্ধতি ধাপে ধাপে অগ্রসরমান হওয়া উচিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রথমে ঐকমত্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।
- অভিযোগ দাখিলকারী শ্রমিকদের প্রতিশোধমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষা দিতে হবে।
- শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিকপক্ষ যৌথভাবে অভিযোগ পদ্ধতি প্রণয়ন করলে তা আরও ভালোভাবে কাজ করে।

অভিযোগ পদ্ধতির বিষয়বস্তু:

অভিযোগ পদ্ধতিতে অবশ্যই এমন একটি প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যার মাধ্যমে শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে উদ্ভূত অভিযোগ ব্যাখ্যা করতে এবং কার্যকরভাবে সমাধান করতে পারেন। সাধারণত, মালিকের কোনো নীতি বা কার্যপ্রণালীর অধীনে অভিযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব পদ্ধতি অবশ্যই স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় লিখিত হতে হবে। অভিযোগ পদ্ধতি অবশ্যই বাস্তবসম্মত, দ্ব্যর্থহীন বা সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর হতে হবে। অভিযোগ পদ্ধতি অবশ্যই মানবসম্পদ বিভাগ বা অনুরূপ কোনো বিভাগ কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাপনাকে অভিযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তাঁদের এ পদ্ধতিতে প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।

উদাহরণ:

একটি অভিযোগ পদ্ধতি বা নীতিতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে:

- উদ্দেশ্য;
- পরিধি;
- সংজ্ঞাসমূহ;
- বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ;
- পক্ষসমূহের ক্ষমতা ও বাধ্যবাধকতা;
- প্রতিনিধিত্বের অধিকার;
- ধাপে ধাপে অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি;
- লজ্জার পরিণতি; এবং
- মানসম্মত ফরমসমূহ।

অভিযোগ পদ্ধতিতে কাজ-সম্পর্কিত সব উদ্বেগের ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে একটি স্পষ্ট যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিফলিত হতে হবে। প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ ন্যায্যসঙ্গত ও ন্যায্য হতে হবে।

অভিযোগ পদ্ধতি শুরু হয় যখন শ্রমিক তাত্ক্ষণিক সুপারভাইজারের কাছে উদ্বেগ উত্থাপন করেন এবং এটি শেষ হয় যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপক তা সমাধান করেন। অভিযোগ পদ্ধতিতে ভিডিও বা অডিও আকারে প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

অভিযোগ পদ্ধতির পুরো সময়জুড়ে একজন শ্রমিককে তাঁর প্রতিনিধিত্বের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে উদ্বেগটি আলোচনা করার জন্য সময় দিতে হবে। শ্রমিক তাঁর তত্ত্বাবধায়ককে না জানিয়ে কর্মক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব অযত্নে ফেলে রেখে যেতে পারবেন না।

উদাহরণ:

১. একজন শ্রমিক তাঁর তত্ত্বাবধায়কের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ উত্থাপন করেন;
২. তত্ত্বাবধায়ক ২ কর্মদিবসের মধ্যে অভিযোগটি তদন্ত করবেন;
৩. এই সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য তাঁর মতামত ও পরামর্শ প্রদান করবেন;
৪. শ্রমিক অসন্তুষ্ট থাকলে, তাঁকে এক সপ্তাহের মধ্যে পরবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনার কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করতে হবে;
৫. ব্যবস্থাপককে অবশ্যই প্রমাণ সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে বিষয়টি আরও তদন্ত করতে হবে;
৬. ব্যবস্থাপককে অবশ্যই ৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন সুপারিশসহ লিখে জমা দিতে হবে;
৭. শ্রমিক অসন্তুষ্ট থাকলে, প্রতিবেদন এবং লিখিত অভিযোগ অবশ্যই ব্যবস্থাপনার পরবর্তী স্তরে প্রদান করতে হবে;
৮. একজন সভাপতি কর্তৃক অভিযোগ গুনানি পরিচালিত হবে, যা মানবসম্পদ বিভাগ আয়োজন করবে;
৯. সভাপতির সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে লিখিতভাবে প্রদান করা হবে;
১০. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে কোনো মীমাংসা বা চুক্তি না হলে, সভাপতি একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন, যা পক্ষসমূহ এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপকের কাছে পাঠানো হবে;
১১. অভিযোগ কার্যধারা এবং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;
১২. এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে জানানো হবে এবং অভিযোগকারী এরপরও অসন্তুষ্ট থাকলে বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার বাইরে উত্থাপনের তাঁর অধিকার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হবে; এবং
১৩. যেকোনো নিষ্পত্তি, সুপারিশ বা সিদ্ধান্তের পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রাখা উচিত।

পরামর্শ:

- শ্রমিকের অভিযোগ যদি সরাসরি তাঁর সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে হয়, তবে শ্রমিক মানবসম্পদ বিভাগের কাছে যেতে পারেন, যারা বিষয়টি ব্যবস্থাপনার পরবর্তী স্তরে অগ্রসর করবে।
- সব কার্যধারা অবশ্যই গোপনীয় রাখতে হবে।
- অভিযোগ পদ্ধতির প্রাথমিক ধাপগুলোর লক্ষ্য হলো অভিযোগকারী এবং প্রভাবিত পক্ষসমূহের মধ্যে একটি সাধারণ নিষ্পত্তি খুঁজে বের করা।
- অভিযোগ পদ্ধতির পরবর্তী ধাপগুলোর লক্ষ্য হলো সুপারিশ প্রদান এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টির উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান।
- অভিযোগ পদ্ধতি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে অসদাচরণ শনাক্ত হলে শৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণের সুপারিশ করতে পারে।
- অভিযোগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে “সবার জন্য একই পদ্ধতি” প্রযোজ্য নয়। অভিযোগ পদ্ধতি তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে, যখন তা যে পরিবেশে ঘটছে সেই পরিবেশ অনুযায়ী উপযোগী করে তৈরি করা হয়। অভিযোগ পদ্ধতি উপযোগী করে তৈরি করা এবং ভবিষ্যৎ মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যকর অভিযোগ পদ্ধতির নির্দেশিকা:

অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতিটি অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে এবং তা ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এমনটি নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বৈষম্য বা

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

প্রতিশোধমূলক আচরণ যাতে না হয়, বিশেষ করে বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন শ্রমিকদের শ্রেণির মধ্যে নারী, কমবয়সী ব্যক্তি, অভিবাসী শ্রমিক, নিম্নস্তরের শ্রমিক, প্রতিনিধিত্বহীন শ্রমিক, স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সংখ্যালঘু জাতিগত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা থাকতে পারেন। শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাপনার কর্তৃপক্ষে অভিযোগ প্রক্রিয়া ও এর ফলাফলের উপর আস্থা থাকা প্রয়োজন।

বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন শ্রমিকরা প্রায়ই কর্মপরিবেশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করেন। তাঁরা নিজেদের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বাইরের ব্যক্তি এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি হিসেবে অনুভব করেন। তাঁরা বরং নতি স্বীকার করেন, কারণ তাঁদের আশঙ্কা থাকে যে প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাঁদের উদ্বেগ ন্যায্যভাবে সমাধান করবে না। প্রায়ই বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন শ্রমিকরা ভয় পান যে তাঁদের অভিযোগ বা মতামত প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বৈষম্য ও প্রতিশোধমূলক আচরণ ডেকে আনবে। অভিযোগ পদ্ধতি এমনভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা উচিত, যাতে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিরা অভিযোগ প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার পান। এটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

অভিযোগ পদ্ধতি মানবসম্পদ বিভাগের প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এসব শ্রমিকদের অবশ্যই অভিযোগ প্রক্রিয়া, শ্রমিকদের বৈচিত্র্য এবং তাঁদের নিরপেক্ষ থাকার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার, সম্মান ও মূল্যায়ন করতে হবে। অভিযোগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা, এর বাস্তব প্রয়োগ এবং ফলাফলের নিয়মিত মূল্যায়ন মানবসম্পদ বিভাগ কর্তৃক পরিচালনা করা প্রয়োজন। এসব মূল্যায়নে শ্রমিকদের কাছ থেকে ব্যবহারকারী মতামতও সংগ্রহ করতে হবে, যার মধ্যে অবশ্যই বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন শ্রমিক বা শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

অভিযোগ পদ্ধতির কার্যকারিতা মূল্যায়নের নির্দেশিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

১. প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, গোপনীয় এবং সব শ্রমিকদের জন্য সহজলভ্য। যেসব শ্রমিক তাঁদের সরাসরি তত্ত্বাবধায়কের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না, অথবা যাদের অভিযোগ সরাসরি তাঁদের তত্ত্বাবধায়কেরই বিরুদ্ধে, তাঁদের জানানো উচিত যে তাঁদের উদ্বেগ বা সমস্যা সমাধানের জন্য মানবসম্পদ বিভাগ নিয়োজিত রয়েছে।
২. মানবসম্পদ প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের অভিযোগ পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা থাকতে হবে।
৩. অভিযোগগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা অভিযোগ পদ্ধতি বা নীতিতে তদন্ত, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ, এবং প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়ার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার বিধান থাকা উচিত।
৪. তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপকদের অভিযোগ কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শ্রমিকদের তাঁদের বোধগম্য ভাষায় অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
৫. যথাযথ বিস্তারিত নথি সংরক্ষণ করা, যাতে অভিযোগ গুরুতর হলে শ্রমিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা রিপোর্টিং লাইনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সেগুলোর উপর নির্ভর করতে পারেন। সেইসাথে অভিযোগসমূহ কত দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে তা নির্ধারণের মাধ্যম হিসেবেও সেগুলো ব্যবহার করা যায়।
৬. অভিযোগ দাখিলকারী ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর প্রতি প্রক্রিয়াটিকে অবশ্যই সহায়ক ও সংবেদনশীল হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ভাষা সমস্যা হতে পারে এমন ক্ষেত্রে যেমন অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে উদ্বেগটি কার্যকরভাবে সমাধানের জন্য দোভাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা অপরিহার্য হতে পারে।
৭. অভিযোগ মোকাবিলা ও নিষ্পত্তির পর শ্রমিকের প্রতিক্রিয়া/মতামত চাইতে হবে।
৮. যেসব ক্ষেত্র বা বিষয়ে সাধারণত অভিযোগ বেশি আসে এবং সেগুলোর নিষ্পত্তি বা ফলাফল ব্যর্থতা ও উন্নতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার জন্য উপযোগী তথ্য প্রদান করে। অভিযোগ প্রক্রিয়া অবশ্যই নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করতে হবে।

পরামর্শ:

- এটি অত্যন্ত অপরিহার্য যে অভিযোগ পদ্ধতিটি যেন কেবল নামমাত্র বা লোকদেখানো উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা না হয়। বরং এর মাধ্যমে যেন যথাযথ তদন্ত পরিচালনা এবং সুপারিশ জমা দেওয়ারও সুযোগ থাকে।
- যদিও অভিযোগ প্রক্রিয়া সময়-সংবেদনশীল হতে পারে তবুও এটা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রমিক যেন বুঝতে পারেন যে তদন্তটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈধ।
- অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফলের নিয়মিত মূল্যায়ন অবশ্যই বছরে অন্তত একবার পরিচালনা করতে হবে।

অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ, এটি শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ, ন্যায্য ও সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া প্রদান করে। বিরোধগুলো যাতে ধারাবাহিক ও ন্যায্যভাবে নিষ্পত্তি হয় এবং শ্রমিকরা যাতে তাঁদের অভিযোগ ও মতামত প্রকাশের সুযোগ পান, তা নিশ্চিত করার জন্য এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল কর্মপরিবেশ বজায় রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারণ করে অভিযোগ পদ্ধতি অভিযোগ উত্থাপন ও নিষ্পত্তির জন্য একটি আনুষ্ঠানিক, ধাপে ধাপে অগ্রসরমান প্রক্রিয়া তৈরি করে। এই কাঠামোটি নিশ্চিত করে যে উভয় পক্ষই একটি স্পষ্ট পথ অনুসরণ করে সরাসরি সুপারভাইজারের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত আপিল পর্যন্ত। এটি বিরোধের তাৎক্ষণিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধ করে, যা প্রায়ই পরিস্থিতিতে আরও শোচনীয় করে তুলতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে নিষ্পত্তিকে উৎসাহিত করে:

কার্যকর অভিযোগ পদ্ধতিগুলো বিরোধকে যতটা সম্ভব নিম্ন স্তরে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রণীত হয়। এর অর্থ হলো, অনেক বিষয় সরাসরি সুপারভাইজার বা ব্যবস্থাপকের সঙ্গে দ্রুত ও অনানুষ্ঠানিকভাবে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। সমস্যাসমূহ জটিল আকার ধারণ করার আগেই সেগুলো সমাধান করার মাধ্যমে এই পদ্ধতি সময় সাশ্রয় করে, মানসিক চাপ কমায় এবং কর্মক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনে।

ন্যায্যতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে:

এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত একটি পদ্ধতিতে স্পষ্ট সময়সীমা, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং আপিলের পথ উন্মুক্ত থাকে। এটি প্রক্রিয়াগত ন্যায্যবিচারকে উন্নীত করে, যেখানে শ্রমিকরা অনুভব করেন যে তাঁদের সমস্যা বা উদ্বেগসমূহ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে এবং নিরপেক্ষভাবে এটির সমাধান করা হচ্ছে। এটি প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে একই ধরনের অভিযোগসমূহের ধারাবাহিক নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতেও সহায়তা করে। এই ব্যবস্থা আস্থা গড়ে তুলতে এবং যেকোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্যের অভিযোগ এড়ানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাহ্যিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কমায়:

একটি স্পষ্ট ও কার্যকর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া প্রদান করার মাধ্যমে অভিযোগ পদ্ধতি প্রায়ই বিরোধকে জনসমক্ষে ছড়িয়ে পড়া বা সালিশকারী কিংবা আদালতের মতো তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা থেকে প্রতিরোধ করতে পারে। এটি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াটিকে মালিক ও শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখে, যা সাধারণত সংশ্লিষ্ট সবার জন্য দ্রুততর এবং কম ব্যয়বহুল হয়।

২.৪.৪ সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

একটি সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-আইসিএমএস (Integrated Conflict Management System) অভ্যন্তরীণভাবে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি অভিযোগ পদ্ধতির মতো একটি একক, প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে একটি ব্যাপক, কার্যকরী কাঠামো তৈরি করে। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানানোর পরিবর্তে, একটি ICMS সংঘাতসমূহকে প্রাথমিক পর্যায়েই নিয়মিতভাবে এবং যতটা সম্ভব নিম্ন স্তরে সমাধান করার চেষ্টা করে। ফলে সেগুলোকে অধিক ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদী বিরোধে রূপ নেওয়া থেকে প্রতিরোধ করে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

সমন্বিত ব্যবস্থার প্রধান নীতিসমূহ:

একটি সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (আইসিএমএস) কেবল একটি হাতিয়ার বা উপকরণ নয়; বরং এটি পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন বিকল্প ও দর্শনের একটি ব্যবস্থা, যা একসঙ্গে কাজ করে। এই ব্যবস্থার গুরুত্ব নিম্নলিখিত নীতিসমূহে নিহিত:

একাধিক বিকল্প:

একটি আইসিএমএস (ICMS) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের বিভিন্ন নিষ্পত্তি বিকল্প প্রদান করে। এর মধ্যে অভিযোগ পদ্ধতি, মধ্যস্থতা, প্রশিক্ষণ এবং সহকর্মী পর্যালোচনা প্যানেল অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরনের পথ প্রদান করার মাধ্যমে শ্রমিকরা তাঁদের পরিস্থিতির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটি বেছে নিতে পারেন, যা তাঁদের সমস্যাসমূহ উপেক্ষা করার পরিবর্তে সেগুলোর মুখোমুখি হতে ও সমাধান করতে উৎসাহিত করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ:

ব্যবস্থাটি শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দেয় যাতকরে তাঁরা সংঘাত দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মোকাবিলা করতে পারেন। এই সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি ছোটখাটো মতবিরোধগুলোকে বড় ধরনের বিরোধে রূপ নেওয়ার আগেই নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করে। সেইসাথে উন্মুক্ত যোগাযোগ ও আস্থার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এর লক্ষ্য হলো সংঘাত নিষ্পত্তিকে কর্মক্ষেত্রের একটি চলমান অংশে পরিণত করা, শেষ অবলম্বন হিসেবে নয়।

ক্ষমতায়ন ও জবাবদিহিতা:

একটি ICMS শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল না রেখে সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। এটি ব্যবস্থাটির বিভিন্ন সম্পদের সহায়তা নিয়ে ব্যক্তি ও ব্যবস্থাপকদের উপর সরাসরি বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করে। ফলে এটি একটি আরও টেকসই ও স্বনির্ভর কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

সংস্কৃতির পরিবর্তন:

শেষ পর্যন্ত, একটি সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি পরিবর্তন করা। এটি এমন একটি কর্মপরিবেশ তৈরি করে, যেখানে সংঘাতকে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয় হিসেবে না দেখে মানবিক সম্পর্কের একটি স্বাভাবিক অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তা গঠনমূলকভাবে সমাধান করা হয়। এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা নিজেদের কথা বলার এবং সম্মান পাওয়ার সুযোগ পান। এতে কর্মী পরিবর্তনের হার কমে, মনোবল বাড়ে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

উল্লেখযোগ্য যে, কিছু বিচারব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা হ্রাস, বিরোধের ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মীবাহিনীর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত অধিকার সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন কারণে এসব চ্যালেঞ্জ আরও কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য বিরোধ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় (CMS) নতুন নতুন ধারণা ও পদ্ধতির বিকাশ ও প্রয়োগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিরাধে নিরসন পদ্ধতির ফলে এসব চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা আরও দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে। জাতীয় পরিস্থিতি এবং অভিযোগের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে, অভিযোগ দাখিলের আগে কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (আইসিএমএস) বাস্তবায়নের একটি অতিরিক্ত পূর্বপ্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে। আইসিএমএস-এর প্রক্রিয়াগুলো কোম্পানির আনুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রক্রিয়া ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হওয়ার আগেই সংঘাত বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে এবং এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের সংখ্যা কমিয়ে আনে।

“একটি ICMS (আইসিএমএস) এর মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি কর্মক্ষেত্র পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা পারস্পরিক সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং ইতিবাচক সম্পর্কে উৎসাহিত করে, এবং পরিশেষে, ব্যক্তি ও সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের উপর বিরোধের নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনে।”^৬

প্রতিষ্ঠানে যতদূর সম্ভব ICMS পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। কারণ উন্নত দেশগুলোতে এটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পদ্ধতির পর্যায়ে পৌঁছানো অভিযোগের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে একটি কার্যকর প্রক্রিয়া হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

৬ কুইন্স ইউনিভার্সিটি, বেলফাস্ট। কর্মক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তি (অভিযোগসমূহ এবং সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা), ডেনিস কারি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, বেলফাস্ট, ১০ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

২.৫ বাহ্যিক শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার গুরুত্ব

যৌথ দর-কষাকষি, কর্মক্ষেত্র সহযোগিতা, অভিযোগ পদ্ধতি এবং সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মতো অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, একটি বাহ্যিক ব্যবস্থাও সমানভাবে অপরিহার্য। এটি একটি নিরপেক্ষ সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে যা অভ্যন্তরীণভাবে নিষ্পত্তি করা যায় না এমন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি ন্যায্য ও কর্তৃত্বপূর্ণ পথ প্রদান করে থাকে।

বাহ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিসমূহ:

অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, বাহ্যিক ব্যবস্থা কয়েকটি স্বতন্ত্র পথ প্রদান করে থাকে। প্রতিটি পদ্ধতিই একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভরশীল। তবে প্রক্রিয়াটি, নিরপেক্ষ পক্ষসমূহের ভূমিকা এবং চূড়ান্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

সমঝোতা বা মধ্যস্থতা:

সমঝোতা বা মধ্যস্থতা হলো স্বেচ্ছামূলক প্রক্রিয়া, যেখানে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ বিরোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে যোগাযোগ করতে, তাঁদের স্বার্থ চিহ্নিত করতে এবং পারস্পরিক চুক্তিতে পৌঁছাতে সহায়তা করে। নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না বা সমাধান আরোপ করে না। বরং তারা একজন সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করে, আলোচনাকে দিকনির্দেশনা দেয় এবং পক্ষসমূহকে একটি সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পেতে সহায়তা করে। সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য এই পদ্ধতি প্রায়ই অগ্রাধিকার পায়, কারণ সমাধান পক্ষসমূহের নিজেদের কাছ থেকেই আসে। দেশভেদে, সমঝোতা সেবা সাধারণত শ্রম মন্ত্রণালয় বা শ্রম বিভাগ অথবা কোনো স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রদান করে থাকে।

সালিশ:

সালিশ একটি অপেক্ষাকৃত আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যেখানে একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ সালিশকারী বেসরকারি বিচারকের মতো কাজ করেন। উভয় পক্ষের প্রমাণ ও যুক্তি শোনার পর সালিশকারী একটি বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন যা “সালিশি রায় বা রোয়েদাদ” নামেও পরিচিত। এই সিদ্ধান্ত সাধারণত আইনগতভাবে বলবৎযোগ্য হয়। সালিশি প্রায়ই আদালতে যাওয়ার তুলনায় দ্রুততর ও কম আনুষ্ঠানিক হয় এবং কখনো কখনো অভিযোগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিচারিক সিদ্ধান্ত:

বিচারিক সিদ্ধান্ত এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক। এটি একটি আইনগত প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো বিরোধ আদালত, ট্রাইব্যুনাল অথবা অন্য কোনো অনুমোদিত সংস্থা যেমন শ্রম আদালত বা শিল্প সম্পর্ক কমিশন দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়। একজন বিচারক বা ট্রাইব্যুনাল সদস্য সব প্রমাণ ও আইনগত যুক্তি পর্যালোচনা করেন এবং আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক রায় প্রদান করেন। মূলত এটি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আইনব্যবস্থার সংস্করণ এবং সাধারণত অন্যান্য পদ্ধতি ব্যর্থ হলে চূড়ান্ত অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাহ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা অনেক সুবিধা প্রদান করতে পারে:

নিরপেক্ষতা ও আস্থা:

বাহ্যিক সংস্থা, যেমন শ্রম আদালত, সালিশকারী, অথবা সমঝোতা/মধ্যস্থতা সেবাসমূহ মালিক ও শ্রমিক উভয়ের থেকেই স্বাধীন। এই নিরপেক্ষতাই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এটি নিশ্চিত করে যে বিরোধ পক্ষপাতহীনভাবে শোনা ও বিচার করা হয়, ফলে প্রক্রিয়ার ন্যায্যতার প্রতি সব পক্ষের আস্থা তৈরি হয়। বিশেষ করে শ্রমিকদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, যখন তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের মালিকের ক্ষমতা বা প্রভাব বেশি।

আইনগত কর্তৃত্ব ও প্রয়োগ:

আনানুষ্ঠানিক অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার বিপরীতে বাহ্যিক নিষ্পত্তি ব্যবস্থার পেছনে প্রায়ই আইনের ক্ষমতা থাকে। সালিশকারী বা শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক হয় এবং তা বলবৎ করা যায়, যা কোনো বিরোধের একটি সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রদান করে। এটি এমন পরিস্থিতি প্রতিরোধ করে, যেখানে কোনো এক পক্ষ কোনো সুপারিশ বা রায়কে উপেক্ষা করতে পারে। যা একটি অ-বাধ্যতামূলক অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় ঘটতে পারে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

জটিল ও গুরুতর বিরোধ মোকাবিলা:

কিছু বিরোধ, বিশেষ করে বৈষম্য, অন্যায় বরখাস্ত, অথবা বৃহৎ পরিসরের যৌথ দরকষাকষি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ, এতটাই জটিল বা ‘উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ’ যা অভ্যন্তরীণভাবে মোকাবিলা করা যায় না। বিশেষত এমন শিল্প বা খাতে, যেখানে জাতীয় স্বার্থ বা অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট থাকে। এ ধরনের মামলা পরিচালনার জন্য বাহ্যিক ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় আইনগত দক্ষতা এবং আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সজ্জিত থাকে। এগুলো ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের আচরণ নির্দেশনার জন্য নজিরও স্থাপন করতে পারে, যার মাধ্যমে আরও স্থিতিশীল ও পূর্বানুমানযোগ্য শিল্প সম্পর্ক পরিবেশ গঠনে অবদান রাখে।

জবাবদিহিতা ও সুশাসন উন্নীতকরণ:

একটি বাহ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে এবং সদিচ্ছাসে কাজ করতে উৎসাহিত করে। মালিকরা জানেন যে, তাঁদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া যদি অন্যায় বা অকার্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়, তবে শ্রমিকরা তাঁদের অভিযোগ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। এটি কোম্পানিগুলোকে বিরোধ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ, ন্যায্য এবং আইনানুগ হতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. বাংলাদেশে আইনি কাঠামো

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ [২০০৬ সালের ৪২ নং আইন] (২০২৬ সালে সংশোধিত)

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক, মজুরি পরিশোধ এবং শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, এবং শ্রমসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত আইনসমূহকে একীভূত ও সংশোধন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন “শিল্প বিরোধ”- কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে: “কোনো ব্যক্তির নিয়োগ বা চাকরির শর্তাবলি বা কাজের শর্তাবলি বা কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে মালিক ও মালিকের মধ্যে, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে অথবা শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো বিরোধ বা মতপার্থক্য।”^৭

৩.১ বিরোধ নিষ্পত্তি-সম্পর্কিত শ্রম আইন, ২০০৬-এর বিধানসমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন-এর চতুর্দশ অধ্যায়ে, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ধারা ২০৯ তে উল্লেখ করা হয়েছে:

“শিল্প বিরোধ উত্থাপন।- কোনো শিল্প বিরোধ বিদ্যমান আছে বলে গণ্য হবে না যদি না তা এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে কোনো মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক উত্থাপিত হয়।”^৮

অধ্যায়টিতে আরও নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে:

ধারা ২১০। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি: এই ধারার অধীনে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ ও বাধ্যতামূলক তিন-ধাপের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সূচনা হয় পক্ষসমূহের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে এবং সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে তা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র-সহায়তাপ্রাপ্ত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়।

আলোচনা (Negotiation)

- সূচনা: কোনো শিল্প বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিলে নিয়োগকর্তা অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (CBA) অপর পক্ষকে লিখিতভাবে সম্ভাব্য বিরোধের বিষয়ে অবহিত করবে।

৭ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ [২০০৬ সালের আইন নং ৪২] (২০২৫ সালে সংশোধিত), অধ্যায় ১, প্রাথমিক, ধারা ২(৬২)

৮ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ [২০০৬ সালের ৪২ নং আইন] (২০২৬ সালে সংশোধিত), অধ্যায় ১৪, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা, ইত্যাদি, ধারা ২০৯।

- সভা: নোটিশপ্রাপ্ত পক্ষকে নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যৌথ দরকষাকষির উদ্দেশ্যে একটি সভার ব্যবস্থা করতে হবে।
- নিষ্পত্তি: আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের সফল নিষ্পত্তি হলে উভয় পক্ষ লিখিত নিষ্পত্তি স্মারক (Memorandum of Settlement) স্বাক্ষর করবে এবং তা সরকার, মহাপরিচালক (Director General) ও সমঝোতাকারীর (Conciliator) নিকট প্রেরণ করবে।

মধ্যস্থতা (Conciliation)

- মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণ: যদি ১৫ দিনের মধ্যে সভার ব্যবস্থা করা না হয়, অথবা প্রথম সভার ১ মাসের মধ্যে কোনো নিষ্পত্তি না হয়, তবে ব্যর্থতার ১৫ দিনের মধ্যে যেকোনো পক্ষ বিষয়টি সরকার-নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর কাছে প্রতিবেদন করতে পারে।
- পদ্ধতি: অনুরোধ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীকে অবশ্যই প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হবে।
- মধ্যস্থতা ব্যর্থ হলে করণীয়: ৩০ দিনের মধ্যে কোনো নিষ্পত্তি না হলে মধ্যস্থতা ব্যর্থ বলে গণ্য হবে (যদি না পারস্পরিক লিখিত সম্মতির মাধ্যমে সময় বাড়ানো হয়)। এরপর পক্ষসমূহ সালিশে যেতে সম্মত না হলে, মধ্যস্থতাকারী ৩ দিনের মধ্যে ব্যর্থতার সনদ প্রদান করবেন।
- তত্ত্বাবধান: মহাপরিচালক যেকোনো সময় কোনো মধ্যস্থতা কার্যধারা নিজের হাতে নিতে বা অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারেন।

সালিশি (Arbitration)

- সালিশকারীর নিকট প্রেরণ: মধ্যস্থতা ব্যর্থ হলে, মধ্যস্থতাকারী পক্ষসমূহকে বিরোধটি কোনো সালিশকারীর কাছে পাঠাতে উৎসাহিত করেন; একজন সালিশকারী পক্ষসমূহের সম্মতিতে (প্রয়োজনে সরকারি প্যানেল থেকে) নির্ধারিত হতে পারেন।
- সালিশি রায় বা রোয়েদাদ: সালিশকারীকে অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ও আপিল অযোগ্য সালিশি রায় বা রোয়েদাদ প্রদান করতে হবে (যদি সময় বাড়ানো না হয়)।
- সালিশি রায় বা রোয়েদাদের কার্যকারিতা: সালিশি রায় বাধ্যতামূলক এবং এটি সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টব্য

যদি মালিকের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশন নিবন্ধিত থাকে, তবে সিবিএ-কে অবশ্যই সেই ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মালিকের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোনো চুক্তি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সব মালিক ও শ্রমিকের উপর অবশ্যই পালনীয় হবে।

ধর্মঘট ও লক-আউট সংক্রান্ত বিধানসমূহ ধারা ২১১-তে সন্নিবেশিত রয়েছে। আইনের এই ধারাতে ধর্মঘট ও লক-আউট শুরু এবং পরিচালনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কার্যক্রম শুরুর আবশ্যিকতা

- নোটিশের সময়সীমা: মধ্যস্থতা ব্যর্থ হওয়ার পর, কোনো পক্ষকে ধর্মঘট বা লক-আউট শুরু করার ৭ থেকে ১৪ দিন আগে নোটিশ প্রদান করতে হবে।
- বিকল্প ব্যবস্থা: শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে পক্ষটি সরাসরি শ্রম আদালতে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ধর্মঘটের বৈধতা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) কর্তৃক ধর্মঘট আহ্বান কেবল তখনই তা বৈধ হবে, যখন গোপন ব্যালটে অনুষ্ঠিত ভোটে সিবিএর অন্তত ৫১% সদস্য ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দেন।

নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে লক-আউট এর বিধান: নতুন, বিদেশি মালিকানাধীন, অথবা বিদেশি সহযোগিতায় পরিচালিত ব্যবসার ক্ষেত্রে উৎপাদন শুরুর তারিখ থেকে ২ বছর পর্যন্ত ধর্মঘট ও লকআউট নিষিদ্ধ।

সরকার ও আদালতের হস্তক্ষেপ

- সরকারের হস্তক্ষেপ: ৩০ দিনের বেশি স্থায়ী যেকোনো ধর্মঘট বা লকআউট বন্ধ করার জন্য সরকার আদেশ দিতে পারে।
- তাত্ক্ষণিক হস্তক্ষেপ: কোনো ধর্মঘট বা লকআউট শুরুর জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করলে বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হলে, সরকার যেকোনো সময় (এমনকি ৩০ দিনের আগেও) তা নিষিদ্ধ করতে পারে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

- **জনস্বার্থমূলক সেবা:** জনস্বার্থমূলক সেবার ক্ষেত্রে সরকার যেকোনো সময় (এমনকি কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেও) শিল্প বিরোধ সংক্রান্ত কর্মসূচি নিষিদ্ধ করতে পারে।
- **আদালতে প্রেরণ:** সরকার যদি কোনো শিল্প বিরোধ সংক্রান্ত কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে, তবে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য অবশ্যই শ্রম আদালতে প্রেরণ করতে হবে।
- **আদালতের রায়:** শ্রম আদালতকে প্রেরণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অবশ্যই একটি রায় প্রদান করতে হবে (যা সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে)। ৬০ দিনের সময়সীমার পরে রায় প্রদান করা হলেও তা বৈধ থাকবে।

ধারা ২১২: শিল্প বিরোধের অবসান

এই ধারার বিধান অনুসারে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে কোনো শিল্প বিরোধ কখন আইনগতভাবে শেষ হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে একই বিষয়ের উপর পুনরায় শিল্প বিরোধ উত্থাপনের উপর কী সীমাবদ্ধতা থাকবে তা নির্ধারণ করে।

- **কখন বিরোধের অবসান ঘটে:** কোনো শিল্প বিরোধ আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, যদি বিরোধ উত্থাপনকারী পক্ষ আইনগতভাবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। এর মধ্যে যে বিষয়গুলি রয়েছে তা হলো:

১. মধ্যস্থতাকারীকে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে ব্যর্থ হওয়া (ধারা ২১০(৪)-এর অধীনে)।
 ২. নোটিশে উল্লিখিত তারিখে ধর্মঘট বা লক-আউট শুরু করতে ব্যর্থ হওয়া (ধারা ২১১(১)-এর অধীনে)।
 ৩. বিরোধটি শ্রম আদালতে প্রেরণ করতে বা ধর্মঘট বা লক-আউটের নোটিশ প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়া (ধারা ২১১(১)-এর অধীনে)।
- **নতুন বিরোধ উত্থাপনে বাধা বা সীমাবদ্ধতা:** প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে একবার কোনো বিরোধের অবসান ঘটলে, মূল বিরোধের অবসানের তারিখ থেকে এক বছর পর্যন্ত একই বিষয়ে নতুন কোনো বিরোধ পুনরায় উত্থাপন করা যাবে না।

ধারা ২১৩। শ্রম আদালতে আবেদন: এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো অধিকার, অথবা রোয়েদাদ, মীমাংসা, চুক্তি, প্রচলিত রীতি, নোটিশ, আদেশ, প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোনোভাবে স্বীকৃত অধিকার কার্যকর করার জন্য কোনো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (CBA), ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক বা শ্রমিক শ্রম আদালতে আবেদন করতে পারবেন।”^৯

ধারা ২১৪-এ শ্রম আদালতের প্রতিষ্ঠা, গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান করা হয়েছে। এ ধারায় শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রম আদালতের কাঠামো ও এখতিয়ার নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা ও এখতিয়ার-

- সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এবং তাদের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এখতিয়ার (আঞ্চলিক সীমা) নির্ধারণ করবেন।
- শ্রম আদালতের নিম্নলিখিত বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একচ্ছত্র এখতিয়ার রয়েছে:
 ১. শিল্প বিরোধ এবং অন্যান্য বিরোধ নিষ্পত্তি।
 ৩. নিষ্পত্তি লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত ও রায় প্রদান।
 ৪. শ্রম আইনের অধীনে অপরাধসমূহের বিচার।

আদালতের গঠন

- **সাধারণ আদালত:** একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন পরামর্শমূলক সদস্য নিয়ে গঠিত।

১. **চেয়ারম্যান:** সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। তাঁকে অবশ্যই বর্তমানে কর্মরত জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ হতে হবে।

^৯ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ [২০০৬ সনের ৪২ নং আইন] (২০২৬ সালে সংশোধিত), অধ্যায় ১৪, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনি কার্যক্রম ইত্যাদি, ধারা ২১৩।

২. সদস্য: মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষে একজন করে প্রতিনিধি, যাদেরকে চেয়ারম্যান সরকারী প্যানেল থেকে নির্বাচিত করেন। তাঁরা লিখিত মতামত প্রদান করেন, যা চূড়ান্ত রায়ে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- অপরাধের বিচার: অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত কেবল চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত হয়।
- কোরাম: কোনো পরামর্শমূলক সদস্য অনুপস্থিত থাকলেও কার্যধারা বৈধ থাকে; তবে আগাম নোটিশ দেওয়া হলে চেয়ারম্যানকে অবশ্যই একজন বিকল্প সদস্য নিয়োগ করতে হবে।

আদালতের আইনগত মর্যাদা

- নির্দিষ্ট আইনগত উদ্দেশ্যে আদালতকে ফৌজদারি আদালত হিসেবে গণ্য করা হয়।
- এর রায়সমূহ শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের অধীনস্থ।

ধারা ২১৫ ও ২১৬ তে শ্রম আদালতের ক্ষমতা ও কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে এবং কীভাবে অপরাধের বিচার পরিচালনা ও অন্যান্য বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে, তার মধ্যে পার্থক্য করে।

ধারা ২১৫ তে, অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে শ্রম আদালতের ক্ষমতা ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোনো শ্রম আদালত কোনো অপরাধের বিচার করে, তখন এটি ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে প্রথম শ্রেণির বিচারিক/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরূপ সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। এই আদালতের দায়রা আদালতের সমতুল্য দণ্ড আরোপের ক্ষমতা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, কোনো অপরাধের বিচার করার সময় আদালত দুইজন পরামর্শমূলক সদস্য ছাড়াই কেবলমাত্র চেয়ারম্যান নিয়ে গঠিত হয়।

২১৬ ধারায়, অপরাধের বিচার ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে শ্রম আদালতের ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে। ধারা ২১৬ অনুযায়ী, শ্রম আদালত দেওয়ানি আদালত হিসেবে কাজ করে থাকে। এই আদালতের সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা, দলিল বা নথিপত্র উপস্থাপনে বাধ্য করা, এবং একতরফা সিদ্ধান্ত প্রদান ও তা বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোন দরখাস্ত বা দলিল পেশ করার জন্য কোনো কোর্ট-ফি প্রয়োজন হয় না, যা প্রক্রিয়াটিকে সহজলভ্য করে তোলে। পদ্ধতিটি দ্রুততার উপর গুরুত্ব দেয়। সাধারণত মূলতবি ৭ দিনের মধ্যে সীমিত রাখে এবং প্রতিপক্ষকে ১০ দিনের মধ্যে জবাব পেশ করতে হয় (প্রয়োজনে অতিরিক্ত ৭ দিনের সময় বাড়ানো যেতে পারে)। পরিশেষে, মামলা দায়েরের ৬০ দিনের মধ্যে আদালতকে অবশ্যই লিখিত রায়, সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ প্রদান করতে হয়। তবে বৈধ ও নথিবদ্ধ কারণ থাকলে সময়সীমা সর্বোচ্চ ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

ধারা ২১৭ তে শ্রম আদালতের রায় ইত্যাদির বিরুদ্ধে আপিল সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ রয়েছে। ২১৭ ধারার বিধান মতে, “এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ বা দণ্ড সংস্কৃত যেকোনো পক্ষ তা প্রদানের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করতে পারবেন, এবং এ ধরনের আপিলের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।”^{১০}

ধারা ২১৮ এ, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল শ্রম বিরোধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে নেতৃত্বে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান যিনি কর্মরত বা সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারক হবেন, এবং এতে একই ধরনের বিচারিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্যান্য সদস্যও থাকতে পারেন। ট্রাইব্যুনাল শ্রম আদালত থেকে আসা আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি করে থাকে এবং কোনো রায় বহাল রাখা, সংশোধন করা, বাতিল করা বা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানোর ক্ষমতা রাখে। এটি সব শ্রম আদালতের উপর তত্ত্বাবধানমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে থাকে।

ট্রাইব্যুনালের রায় অবশ্যই আপিল দায়েরের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে (যা ৯০ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে) এবং সদস্যদের মধ্যে মতের সমতা দেখা দিলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এছাড়াও, ট্রাইব্যুনাল আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দিতে পারেন এবং এ ধরনের দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাবে।

১০ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ [২০০৬ সালের ৪২ নং আইন] (২০১৮ সালে সংশোধিত), অধ্যায় ১৪, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা, ইত্যাদি, ধারা ২১৭।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

ধারা ২১৯-এ দরখাস্ত বা আপিলের ফরম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারা শ্রম আদালতে দরখাস্ত পেশ বা ট্রাইব্যুনালে আপিল পেশের সময় যেসব বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা উল্লেখ করে। এর মাধ্যমে মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা হয়। আবেদন বা আপিলে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

- সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের নাম ও ঠিকানা;
- পরিস্থিতির বা ঘটনার একটি স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রার্থিত প্রতিকার;
- যে নির্দিষ্ট আইনের অধীনে দরখাস্ত বা আপিল পেশ করা হচ্ছে তার বিবরণ;
- আবেদন বা আপিল দাখিলের/পেশের ক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব হলে তার কারণ;
- মামলার ধরনের উপর নির্ভর করে অন্যান্য নির্দিষ্ট বিবরণ, যেমন-বকেয়া মজুরির হিসাব, দুর্ঘটনার নোটিশের তারিখ, অথবা বিরোধের কোন কোন বিষয়ে সম্মত হয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে সম্মত হয়নি, সে সম্পর্কে বিবৃতি।

ধারা ২২০ এ, মামলার পক্ষসমূহের উপস্থিতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে যে, “সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপস্থিতির ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালের সামনে কোনো ব্যক্তির দরখাস্ত পেশ, হাজিরা প্রদান, অথবা অন্য কোনো কাজ তিনি সয়ং নিজে, অথবা তাঁর কাছ থেকে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধি অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে করতে পারবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এমন প্রতিনিধি বা আইনজীবী সংশ্লিষ্ট আদালতের কোনো প্রতিনিধি হতে পারবেন না।”^{১১}

মামলার খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে ধারা ২২১-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারার বিধানমতে, “শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালের বিচারার্থীন কোনো মোকদ্দমা (মামলা) বা আপিলের সঙ্গে সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক সব খরচ, এই আইন বা কোনো বিধির অধীনে, উক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনা অনুযায়ী প্রদেয় হবে।”^{১২}

ধারা ২২২-এ কোন কোন ব্যক্তি বা পক্ষ নিষ্পত্তি ও রোয়েদাদ মানতে বাধ্য হবেন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ধারা কোনো বহিঃস্থ বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্থার মাধ্যমে গৃহীত নিষ্পত্তি, রোয়েদাদ বা রায়ের পরিধি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সিদ্ধান্তটি বিরোধের সকল প্রত্যক্ষ পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। শ্রম আদালত যদি অন্য কোনো পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়, তবে তাদের ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে। মালিকের ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তটি তাঁর উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তদের জন্যও পালনীয় হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যদি কোনো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কোনো পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে সিদ্ধান্তটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের জন্য পালনীয় হবে। তাঁরা বিরোধ শুরু হওয়ার সময় কর্মরত ছিল কি না, অথবা ওই তারিখের পরে কাজে যোগ দিয়েছে কি না, তা বিবেচ্য নয়। তবে কোনো মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে (সালিশি প্রক্রিয়ার বাইরে) যে নিষ্পত্তি সম্পাদিত হয়, তা কেবল সেই পক্ষগুলোর জন্যই পালনীয় হবে যারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

ধারা ২২৩-এ নিষ্পত্তি ও রোয়েদাদ কখন কার্যকর হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারা নিষ্পত্তি ও রোয়েদাদের কার্যকারিতা শুরুর তারিখ এবং মেয়াদ সম্পর্কে বিস্তারিত সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **নিষ্পত্তি:** পক্ষসমূহ যে তারিখে সম্মত হয়, সেই তারিখে এই নিষ্পত্তিটি কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি কোনো তারিখ নির্দিষ্ট করা না থাকে, তবে নিষ্পত্তিনামা স্বাক্ষরের তারিখে তা কার্যকর বলে গণ্য হবে। পক্ষসমূহ যে সময়ের জন্য সম্মত হয়েছে, সেই সময় পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকে। যেক্ষেত্রে কোনো সময় নির্ধারিত না থাকলে এক বছরের জন্য এটা বলবৎ থাকবে। এই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই নিষ্পত্তিটি পালনীয় থাকবে, যতক্ষণ না কোনো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে এর দ্বারা আর আবদ্ধ থাকতে না চাওয়ার অভিপ্রায় জানিয়ে দুই মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান করে।

১১ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ [২০০৬ সালের ৪২ নং আইন] (২০২৫ সালে সংশোধিত), অধ্যায় ১৪, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা, ইত্যাদি, ধারা ২২০।

১২ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ [২০০৬ সালের ৪২ নং আইন] (২০২৫ সালে সংশোধিত), অধ্যায় ১৪, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা, ইত্যাদি, ধারা ২২১।

- **রোয়েদাদ:** শ্রম আদালতের কোনো রোয়েদাদ আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখে কার্যকর হয় এবং আপিল দায়ের করা না হলে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে। আদালতকে অবশ্যই রোয়েদাদের প্রতিটি দাবির জন্য কার্যকারিতা শুরু তারিখ এবং বাস্তবায়নের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।
- **রোয়েদাদ পরিবর্তন:** কোনো পক্ষ শ্রম আদালতে আবেদন করে রোয়েদাদের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ করতে পারে। যদি তাঁরা প্রমাণ করতে পারে যে মূল পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।
- **রোয়েদাদের ধারাবাহিকতা:** নিষ্পত্তির মতোই, কোনো রোয়েদাদ তার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও পালনীয় থাকবে, যতক্ষণ না কোনো এক পক্ষ এর দ্বারা আবদ্ধ না থাকার অভিপ্রায় জানিয়ে দুই মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান করে।
- **নতুন বিরোধ উত্থাপনের নিষেধাজ্ঞা:** কোনো নিষ্পত্তি বা রোয়েদাদ স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ অথবা এর কার্যকারিতার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ, যেটি পরে ঘটে, থেকে এক বছরের মধ্যে একই বিষয়ে কোনো নতুন শিল্প বিরোধ উত্থাপন করা যাবে না। ধারা ২২৪-এ কার্যধারা শুরু ও সমাপ্তির বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে কখন শুরু ও শেষ হবে, তা স্পষ্ট করা হয়েছে। আইনগত ও প্রক্রিয়াগত সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

সালিশি কার্যধারা (Arbitration Proceedings) -

- **শুরু:** সালিশি প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় সেই মুহূর্তে, যখন সালিশিকারক একটি আনুষ্ঠানিক অনুরোধ গ্রহণ করেন।
- **শেষ বা সমাপ্তি (সফল হলে):** যদি নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো যায়, তবে সব পক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি স্মারকলিপি স্বাক্ষরের তারিখে সালিশি কার্যধারা সমাপ্ত হয়।
- **শেষ (সফল না হলে):** যদি নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো না যায়, তবে সালিশি কার্যধারা নিম্নলিখিত যেকোনো তারিখে সমাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে:

১. যে তারিখে সালিশিকারী তাঁর রোয়েদাদ প্রদান করেন (যদি বিরোধটি সালিশিকারীর কাছে পাঠানো হয়)।
২. সালিশি কার্যধারা ব্যর্থ হয়েছে মর্মে সালিশিকারক যেদিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন।

মধ্যস্থতা কার্যধারা (Conciliation Proceedings):

- **শুরু:** মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় সেই মুহূর্তে, যখন মধ্যস্থতাকারী একটি আনুষ্ঠানিক অনুরোধ গ্রহণ করেন।
- **শেষ বা সমাপ্তি (সফল হলে):** যদি নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো যায়, তবে সব পক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি স্মারকলিপি স্বাক্ষরের তারিখে মধ্যস্থতা কার্যধারা সমাপ্ত হয়।
- **শেষ (সফল না হলে):** যদি নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো না যায়, তবে মধ্যস্থতা কার্যধারা নিম্নলিখিত যেকোনো তারিখে সমাপ্ত হতে পারে:

১. যে তারিখে মধ্যস্থতাকারী তাঁর রোয়েদাদ প্রদান করেন (যদি বিরোধটি মধ্যস্থতাকারীর কাছে পাঠানো হয়)।
২. মধ্যস্থতা কার্যধারা ব্যর্থ হয়েছে মর্মে মধ্যস্থতাকারী যেদিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন।

শ্রম আদালতের কার্যধারা -

- **সূচনা:** শ্রম আদালতের সামনে কোনো কার্যধারা শুরু হয় সেই তারিখে, যেদিন বিরোধ, প্রশ্ন বা বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রম আদালতে প্রেরণ করা হয়।
- **সমাপ্তি:** কার্যধারা সমাপ্ত হয় সেই তারিখে, যেদিন শ্রম আদালত তার চূড়ান্ত রায়, সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ প্রদান করেন।

ধারা ২২৫, ২২৬ এবং ২২৭-এ ধর্মঘট ও লক-আউটের নিষেধাজ্ঞা এবং বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইনের এই তিনটি ধারা কোন পরিস্থিতিতে ধর্মঘট ও লক-আউট নিষিদ্ধ এবং কোন কারণে তা বেআইনি হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই ধারাগুলো একত্রে শিল্প-সংক্রান্ত কর্মসূচি কখন ও কীভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে আইনি কার্যক্রম সম্পন্ন হতে দেওয়া এবং বিদ্যমান নিষ্পত্তি ও রোয়েদাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

২২৫ ধারায় বিচারাধীন কার্যধারা চলাকালীন নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে, একটি স্পষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিরোধ-সংশ্লিষ্ট কোনো মামলা যদি ইতিমধ্যে মীমাংসা প্রক্রিয়াধীন থাকে, শ্রম আদালতে বিচারাধীন থাকে, অথবা ট্রাইব্যুনালে কোনো আপিল বিচারাধীন থাকে, তবে ধর্মঘট বা লক-আউটের নোটিশ প্রদান করা যাবে না। এর উদ্দেশ্য হলো আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াগুলো যাতে শিল্প-সংক্রান্ত কর্মসূচির কারণে ব্যাহত না হয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

ধারা ২২৬ এ, ধর্মঘট ও লক-আউট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে, শ্রম আদালত এবং ট্রাইব্যুনালকে চলমান ধর্মঘট বা লক-আউট বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কোনো মামলা যদি আদালতে বিবেচনাধীন থাকে, তবে ইতিমধ্যে শুরু হওয়া কোনো ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ করার জন্য শ্রম আদালত লিখিত আদেশ জারি করতে পারে। বিরোধ-সংশ্লিষ্ট কোনো আপিল ট্রাইব্যুনালের সামনে আনা হলে, চলমান ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ করার একই ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালেরও থাকবে।

ধারা ২২৭ এ ধারা ২২৭-এ বেআইনি ধর্মঘট বা লক-আউটের সংজ্ঞা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিধান করা হয়েছে। কোন কোন পরিস্থিতিতে কোনো ধর্মঘট বা লক-আউট বেআইনি হিসেবে গণ্য হবে, এ ধারায় তা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনো ধর্মঘট বা লক-আউট বেআইনি হবে, যদি:

- এটি যথাযথ নোটিশ পদ্ধতি অনুসরণ না করে শুরু করা বা অব্যাহত রাখা হয়, অথবা নোটিশে উল্লিখিত তারিখ ব্যতীত অন্য কোনো তারিখে সংঘটিত হয়, কিংবা ধারা ২২৫ লঙ্ঘন করা হয়।
- এটি এমন কোনো বিরোধের ফল হয়, যা যথাযথ নিয়ম মেনে উত্থাপন করা হয়নি।
- সরকারের (ধারা ২১১-এর অধীনে) অথবা শ্রম আদালত/ট্রাইব্যুনালের (ধারা ২২৬-এর অধীনে) নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ সত্ত্বেও এটি অব্যাহত থাকে।
- একই বিষয়ে কোনো নিষ্পত্তি বা রোয়েদাদ কার্যকর থাকা অবস্থায় এটি সংঘটিত হয়।

তবে, বেআইনি ধর্মঘটের কারণে ঘোষিত কোনো লক-আউট বেআইনি হিসেবে গণ্য হবে না। একইভাবে, বেআইনি লক-আউটের কারণে ঘোষিত কোনো ধর্মঘটও বেআইনি হিসেবে গণ্য হবে না। এটি বেআইনি কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণকারী পক্ষের জন্য একটি সীমিত সুরক্ষা প্রদান করে।

ধারা ২২৮, ২২৯ এবং ২৩০-এ বিরোধে সুরক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এসব ধারা বিরোধ চলাকালে শ্রমিকদের সুরক্ষা, বেআইনি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো ব্যক্তিদের অধিকার, এবং বিভিন্ন কার্যধারায় পক্ষসমূহ কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, এসব বিষয় সম্পর্কিত বিধান বলা আছে। শ্রম বিরোধ চলাকালে ন্যায্যতা ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, ঝুঁকিপূর্ণ বা দুর্বল শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান, এবং সব পক্ষের অংশগ্রহণের নিয়মাবলী স্পষ্ট করার জন্য এসব ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- ধারা ২২৮-এ বিচারাধীন কার্যধারাকালে শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়ে বিধান করা হয়েছে। এই ধারায় কোনো বিরোধ মধ্যস্থতাকারী, সালিসকারক, শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন থাকাকালে শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির শর্তাবলি তার প্রতিকূলে বা অসুবিধাজনক উপায়ে পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ।
- কোনো মালিক কোনো শ্রমিককে অব্যাহতি, বরখাস্ত, বা শাস্তি প্রদান, অথবা তার চাকরির অবসান করতে পারবেন না, যদি না অসদাচরণটি বিরোধের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন হয়।
- বিশেষভাবে, কোনো ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাকে শ্রম আদালতের স্পষ্ট পূর্বানুমতি ছাড়া অসদাচরণের কারণে বরখাস্ত করা বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

ধারা ২২৯, অংশগ্রহণ না করা ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই ধারা এমন ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান করে যারা বেআইনি ধর্মঘট বা বেআইনি লক-আউটে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

- কোনো ব্যক্তি অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে, সে কারণে তাকে তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বহিস্কার করা যাবে না, জরিমানা করা যাবে না, অথবা দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

- তারা সাধারণত যে অধিকার বা সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, তা থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না; এবং অন্যান্য ইউনিয়ন সদস্যদের তুলনায় তাদেরকে কোনো প্রতিকূল অবস্থানে রাখা যাবে না।
- কোনো ব্যক্তিকে যদি বেআইনিভাবে ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার করা হয়, তবে শ্রম আদালত তাঁকে পুনরায় সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে ইউনিয়নকে সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারে।

ধারা ২৩০এ-তে পক্ষসমূহের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিধান করা হয়েছে। এ ধারায় কোনো বিরোধে শ্রমিক ও মালিকদের পক্ষে কারা প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন, তা নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন শ্রমিক তার যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

একজন মালিক তার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো, আইনজীবীদের মধ্যস্থতা কার্যধারা চলাকালীন কোনো পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি নেই।

তবে, কোনো পক্ষ সালিসের সামনে কোনো কার্যধারায়, তার অনুমতিক্রমে, কোনো আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

ধারা ২৩১-এ নিষ্পত্তি ও রোয়েদাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধান করা হয়েছে: “(১)কোনো নিষ্পত্তি বা রোয়েদাদের কোনো বিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনো অসুবিধা বা সন্দেহ দেখা দিলে, তা ট্রাইব্যুনাতে প্রেরণ করা হবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে শুনানির সুযোগ প্রদান করার পর বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে এবং এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং পক্ষসমূহের উপর পালনীয়/বাস্ত্যতামূলক হবে।”^{১৩}

ব্যক্তিগত এবং যৌথ উভয় ধরনের শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করার জন্য একটি নতুন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর/ADR) কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। এটি নিরপেক্ষ ও ন্যায্যভাবে কাজ করবে।

সরকার এই কর্তৃপক্ষের জন্য একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করবে। নিম্নোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হতে পারেন:

- একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ,
- শ্রম অধিকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম মান বিষয়ক অভিজ্ঞ একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, অথবা
- বেসরকারি পর্যায়ে একজন অভিজ্ঞ পেশাজীবী।

এডিআর কর্তৃপক্ষ কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যালয় স্থাপন করবে।

কর্তৃপক্ষের জন্য থাকবে:

- সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করার জন্য মধ্যস্থতাকারীদের একটি প্যানেল, এবং
- প্রয়োজনে সালিস পরিচালনার জন্য সালিশকারকদের একটি প্যানেল।

সরকার কর্তৃক গঠিত একটি গভর্নিং বডি বা পরিচালনা পর্ষদ, যার মধ্যে মালিক, শ্রমিক এবং সরকারের প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন (ত্রিপক্ষীয়)-এই কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক কার্যক্রম তদারকি করবে।

১. গভর্নিং বডি:

- শ্রম অধিদপ্তর (DOL) এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) মনোনীত তালিকা থেকে মধ্যস্থতাকারীগণকে নিয়োগ করবে, এবং
- সালিশকারকগণের প্যানেল গঠন করবে।

১৩ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ [২০০৬ সালের ৪২ নং আইন] (২০২৫-১৮ সালে সংশোধিত), অধ্যায় ১৪, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা, ইত্যাদি, ধারা ২৩১।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

এসব পদে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়াবলী বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হবে।

বিধিতে গভর্নিং বডির সদস্যদের কীভাবে মনোনীত করা হবে, তাও উল্লেখ করা হবে।

গভর্নিং বডির সদস্যদের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে।

৩.২ মালিক ও শ্রমিকদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ চাকরির শর্তাবলি, মজুরি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিরোধ নিষ্পত্তিসহ বিস্তৃত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আইনের অধীনে মালিক ও শ্রমিক উভয়ের প্রধান অধিকার ও বাধ্যবাধকতার একটি রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো:

৩.২.১ মালিকদের বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্ব

মজুরি ও সুবিধাদি: মালিকগণ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, দুর্ঘটনাজনি ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য আইনসম্মত সুবিধাদি প্রদান করতে বাধ্য। বিশেষভাবে, ধারা ১৫০ অনুযায়ী এমন শারীরিক আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যতামূলক, যা তিন দিনের বেশি সময়ের জন্য কাজ করার সক্ষমতা হ্রাস করে। এছাড়াও, মজুরি অবশ্যই মজুরি-মেয়াদ শেষ হওয়ার সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রদান করতে হবে অথবা চাকরিচ্যুত শ্রমিকের ক্ষেত্রে তিন কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে (ধারা ১২৩)।

চাকরি ও নথিপত্র: মালিকদের প্রত্যেক স্থায়ী, অস্থায়ী বা সাময়িক শ্রমিককে তার চাকরির অবস্থা উল্লেখ করে একটি টিকিট বা কার্ড প্রদান করতে হবে (ধারা ৯)। এছাড়াও তাদেরকে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য একটি সার্ভিস বই সংরক্ষণ করতে হবে (ধারা ৬)। চাকরির অবসান হলে একটি অব্যাহতি সনদ প্রদান করতে হবে (ধারা ৩১)।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: মালিকগণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। এর মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, যথাযথ বায়ু চলাচল এবং পয়ঃনিষ্কাশন বা স্যানিটেশন নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ধারা ৫১ ও ৫২)। পাশাপাশি প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত সব বিধান বা নিয়মাবলী পরিপালন করা (অধ্যায় ৬ ও ৭)

চাকরির অবসান: কোনো শ্রমিকের চাকরির অবসানের ক্ষেত্রে মালিককে অবশ্যই নির্দিষ্ট আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যার মধ্যে যথাযথ নোটিশ প্রদান অথবা নোটিশের পরিবর্তে অর্থ প্রদান, এবং প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (ধারা ২৬)।

বিরোধ চলাকালে সুরক্ষা: কোনো বিরোধ -এর মধ্যস্থতাকারী, সালিশকারী, শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচারাধীন থাকাকালে, মালিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো শ্রমিকের চাকরির শর্তাবলি তাঁর প্রতিকূলে পরিবর্তন করতে পারবেন না বা তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না (ধারা ২২৮)।

কর্মঘণ্টা ও অতিরিক্ত সময়: স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা যাতে দিনে ৮ ঘণ্টা বা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি না হয় তা নিশ্চিত করা, এবং অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করা (অধ্যায় ৯)।

কল্যাণমূলক সুবিধাদি: পানীয় জল, ধোয়ার সুবিধা, বিশ্রামাগার এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যয়সহ কল্যাণমূলক সুবিধাদি প্রদান করা। বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ক্যান্টিন ও শিশু কক্ষও প্রদান করতে হবে, যার মধ্যে নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা (অধ্যায় ৮)।

প্রসুতি কল্যাণ সুবিধা: যোগ্য নারী শ্রমিকদের প্রসুতিকালীন ছুটি এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান করা (অধ্যায় ৮)।

শিশুশ্রম: ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ করা থেকে বিরত থাকা এবং কিশোর শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে (১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী) কর্মঘণ্টা ও কাজের শর্তাবলি সম্পর্কে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা (অধ্যায় ৩)।

অসৎ শ্রম আচরণ: মালিকরা অসৎ শ্রম আচরণে জড়িত হতে পারবেন না। যেমন- শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান থেকে নিরুৎসাহিত করা, ইউনিয়ন সদস্যদের প্রতি বৈষম্য করা, অথবা তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা (ধারা ১৯৫)।

ধারা ১৯৫-এ মালিকদের পক্ষ থেকে অসৎ শ্রম আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এই ধারা মালিক, মালিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, অথবা তাদের প্রতিনিধিদের এমন কোনো চর্চায় জড়িত হওয়া স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে। এটি শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে।

মূল নিষেধাজ্ঞাসমূহ –

মালিকরা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন না, যা:

১. ইউনিয়ন সদস্যপদ সীমিত করে:

চাকরির চুক্তিতে এমন কোনো শর্ত আরোপ করা, যা কোনো শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান বা সদস্যপদ অব্যাহত রাখার অধিকারকে সীমিত করে।

২. বৈষম্য ও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা:

- কোনো শ্রমিকের ইউনিয়নের সদস্য হওয়া বা সদস্য না হওয়ার ভিত্তিতে তাকে চাকরিতে নিয়োগ দিতে অস্বীকার করা, অথবা চাকরি, পদোন্নতি বা চাকরির শর্তাবলির ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে বৈষম্য করা।
- কোনো শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার কারণে, অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা হতে ইচ্ছুক হওয়ার কারণে, অথবা ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কারণে তাকে বরখাস্ত, অব্যাহতি, অথবা তার চাকরির ক্ষতি করার হুমকি প্রদান করা।

১. জবরদস্তি ও প্রলোভন:

- কোনো শ্রমিককে ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়া থেকে বিরত রাখতে, অথবা এমন পদ ত্যাগ করতে প্ররোচিত করা বা সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা।
- কোনো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা সিবিএ কর্মকর্তাকে কোনো নিষ্পত্তিতে সম্মত হতে বাধ্য করার জন্য ভয়ভীতি, হুমকি, জবরদস্তি, অথবা শারীরিক ক্ষতি ব্যবহার করা। যার মধ্যে বিদ্যুৎ বা পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাও অন্তর্ভুক্ত।

২. হস্তক্ষেপ:

- কোনো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা সিবিএ নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করা বা প্রভাব বিস্তার করা (ধারা ২০২)।
- ধারা ১৮৭ লঙ্ঘন করে প্রধান ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের, যেমন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো কর্মকর্তাকে বদলি করা।

৩. বিরোধ-সংশ্লিষ্ট চর্চা:

- বৈধ ধর্মঘট চলাকালে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করা, যদি না যন্ত্রপাতির ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য কোনো সালিশকারী সীমিত পরিসরে অস্থায়ী নিয়োগের অনুমতি প্রদান করেন।
- শিল্প বিরোধ সম্পর্কে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা সিবিএ-এর যোগাযোগের জবাব দিতে ব্যর্থ হওয়া।
- বেআইনি লক-আউট শুরু করা, অব্যাহত রাখা বা উসকানি দেওয়া।

৪. অংশগ্রহণ কমিটি:

অংশগ্রহণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যবস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হওয়া।

মালিক নিম্নলিখিত কার্যক্রমে জড়িত হতে পারবেন না:

- ব্ল্যাক লিস্টিং বা কালো তালিকাভুক্তকরণ নিষিদ্ধ: কোনো মালিক যদি কোনো শ্রমিক বা ইউনিয়ন প্রতিনিধির চাকরির অবসান ঘটান, তবে তিনি ওই ব্যক্তিকে কালো তালিকাভুক্ত করে কোনো নোটিশ জারি করতে পারবেন না বা তাঁর তথ্য কোনো কালো তালিকা-সংক্রান্ত ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন না।
- মালিক-নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন নিষিদ্ধ: মালিকগণ এমন কোনো শ্রমিক সংগঠন গঠন, প্রচার বা উৎসাহিত করতে পারবেন না, যা মালিক দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন বা প্রভাবাধীন।
- কোনো ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে মালিকগণ সেই ট্রেড ইউনিয়নকে আর্থিক বা অন্য কোনো সহায়তা প্রদান করতে পারবেন না।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

- **ইউনিয়ন নেতাদের লক্ষ্যবস্তু করা নিষিদ্ধ:** বিদ্যমান কোনো ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষতি করার বা প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন গঠনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে মালিকগণ ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করতে বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন না।
- **প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা বা বৈষম্য নিষিদ্ধ:** কোনো শ্রমিক বা চাকরিপ্রার্থীর বিরুদ্ধে মালিকগণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে, তাকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলতে, অথবা প্রতিশোধমূলক আচরণ করতে পারবেন না, যদি তিনি/তারা:
 ১. অভিযোগ দায়ের করে থাকেন – অতীতে, বর্তমানে, অথবা ভবিষ্যতে করার সম্ভাবনা থাকে;
 ২. কোনো তদন্ত বা আইনি কার্যধারায় অংশগ্রহণ করে থাকেন;
 ৩. লঙ্ঘন সম্পর্কে কোনো হেল্পলাইন বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন, অথবা
 ৪. কোনো অসৎ শ্রম আচরণ সংক্রান্ত তদন্তে সাক্ষী হিসেবে কাজ করে থাকেন।

৩.২.২ মালিকদের অধিকার

বিরোধ নিষ্পত্তি: মালিকগণের কোনো শিল্প বিরোধ বিচারিক নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে প্রেরণের অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর (ধারা ২১১(১))।

আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ: চলমান কোনো বিরোধের সঙ্গে সম্পর্কহীন অসদাচরণের জন্য মালিকরা কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন (ধারা ২২৮(১))।

আইনি সুরক্ষা: আইনের পদ্ধতি লঙ্ঘনকারী বেআইনি ধর্মঘট বা লক-আউট, অথবা একই বিষয়ে কোনো নিষ্পত্তি বা রোয়েদাদ কার্যকর থাকা অবস্থায় সংঘটিত ধর্মঘট বা লক-আউটের বিরুদ্ধে মালিকগণ আইনগতভাবে সুরক্ষিত (ধারা ২২৭)।

৩.২.৩ শ্রমিকদের অধিকার

ক্ষতিপূরণ: শ্রমিকদের চাকরির সময়কালীন বা চাকরির প্রেক্ষিতে সংঘটিত শারীরিক আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যদি উক্ত আঘাত তিন দিনের বেশি সময়ের জন্য কাজ করার সক্ষমতা হ্রাস করে (ধারা ১৫০)।

মজুরি ও পাওনা: শ্রমিকদের আইনে সংজ্ঞায়িত সব মজুরি এবং অন্যান্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কোনো মালিক মজুরি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, শ্রমিকরা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বকেয়া মজুরি আদায় করতে পারেন (ধারা ১২২ ও ১২৩)।

ছুটি: শ্রমিকদের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে বার্ষিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং উৎসব ছুটিসহ বিভিন্ন ধরনের অনুপস্থিতির ছুটির জন্য আবেদন করার এবং তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে (অধ্যায় ৯)।

সংগঠনের স্বাধীনতা: শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে, এবং শিল্প বিরোধে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা সিবিএ-এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রয়েছে (ধারা ১৭৬)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০২৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী, যেসব ব্যক্তি প্রধানত প্রশাসনিক, তদারকি বা ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁরা সংশ্লিষ্ট সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো সমিতি গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রাখেন।

বেআইনি কার্যকলাপ থেকে সুরক্ষা: বেআইনি ধর্মঘট বা বেআইনি লক-আউটে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে শ্রমিকরা ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কার, জরিমানা বা অন্য কোনো শাস্তি থেকে সুরক্ষিত (ধারা ২২৯)।

কর্মঘণ্টা ও অতিরিক্ত সময়: শ্রমিকদের দিনে ৮ ঘণ্টার আইনি সীমার বেশি কাজ না করার অধিকার রয়েছে এবং স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে (অধ্যায় ৯)।

কল্যাণ ও নিরাপত্তা: আইনে নির্ধারিত যথাযথ কল্যাণমূলক সুবিধা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাসম্পন্ন পরিবেশে কাজ করার অধিকার শ্রমিকদের রয়েছে (অধ্যায় ৬, ৭ ও ৮)।

প্রসূতিকালীন সুবিধা: নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি গ্রহণ এবং প্রসূতিকালীন সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে (অধ্যায় ৪)।

নথিপত্র: শ্রমিকদের সার্ভিস বই পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং তাদের চাকরির অবসানের পর অব্যাহতি সনদ পাওয়ার অধিকার রয়েছে (ধারা ৬ ও ৩১)।

বিরোধ নিষ্পত্তি: শ্রমিকদের চাকরির অবসানসংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার রয়েছে (ধারা ২৫)।

► শ্রমিকদের বিরোধ নিষ্পত্তির অধিকার –

► কোনো শ্রমিক এই অধিকার প্রধানত তার যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা সিবিএ-এর মাধ্যমে প্রয়োগ করেন। এটি একটি নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন, যা শিল্প বিরোধে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে (ধারা ১৭৬)। সিবিএ মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করে থাকে।

► কোনো বিরোধ সরাসরি নিষ্পত্তি করা না গেলে, প্রক্রিয়াটি একটি আনুষ্ঠানিক, বহু-ধাপবিশিষ্ট ব্যবস্থায় অগ্রসর হয়ে থাকে। যথা:

১. **মধ্যস্থতা:** বিরোধটি প্রথমে একজন মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়; তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা, যিনি পক্ষসমূহের মধ্যে নিষ্পত্তি মধ্যস্থতার চেষ্টা করেন। এই সময়ে প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে চলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ থাকে (ধারা ২২৫)।
২. **সালিশ অথবা শ্রম আদালত:** মধ্যস্থতা ব্যর্থ হলে, পক্ষসমূহ হয় বিরোধটি কোনো সালিশকারীর কাছে প্রেরণে সম্মত হতে পারে, অথবা যে পক্ষ বিরোধ উত্থাপন করেছে তারা সরাসরি বিচারিক নিষ্পত্তির জন্য মামলাটি শ্রম আদালতে নিতে পারে (ধারা ২১১(১))। শ্রম আদালত হলো এসব নির্দিষ্ট ধরনের মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষায়িত বিচারিক সংস্থা (ধারা ২১৪)।
৩. **আপিল:** কোনো পক্ষ শ্রম আদালতের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে, তাদের শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করার অধিকার রয়েছে (ধারা ২১৮)। এর মাধ্যমে বিরোধটি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দ্বারা পর্যালোচনার সুযোগ পায় এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার নীতি বজায় থাকে।

৩.২.৪ শ্রমিকদের বাধ্যবাধকতা

আইনি পদ্ধতি অনুসরণ: শ্রমিকরা বিরোধ উত্থাপনের ক্ষেত্রে সঠিক আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য। এর মধ্যে ধর্মঘটের পক্ষে সিবিএ-এর ৫১% সদস্যের গোপন ব্যালটে ভোট দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (ধারা ২১১(১))।

নোটিশ: ছুটির আবেদন করার সময় শ্রমিকদের লিখিতভাবে অনুপস্থিতির নোটিশ প্রদান করতে হবে (অধ্যায় ৮)।

আচরণ: শ্রমিকদের মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ ও চাকরির বিধি মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে মালিকের সম্পত্তির ইচ্ছাকৃত ক্ষতি না করাও আচরণের মধ্যে পড়ে।

বিরোধ নিষ্পত্তি: শ্রমিকরা সালিশ, শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষ্পত্তি, রোয়েদাদ এবং রায়ের শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য (ধারা ২২২ ও ২২৩)।

ধারা ১৯৬-এ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অসৎ শ্রম আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এই ধারা শ্রমিক, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, অথবা তাদের প্রতিনিধিদের যেসব নির্দিষ্ট কার্যক্রমে জড়িত হওয়া নিষিদ্ধ, তা বর্ণনা করে। যার মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা এবং বৈধ শিল্প কর্মসূচি নিশ্চিত করা।

ধারা ১৯৬ক। ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য: কোনো মালিক যদি কোনো শ্রমিকের চাকরির শর্তাবলি লঙ্ঘন করেন এবং ঐ শ্রমিক অসৎ শ্রম আচরণ সম্পর্কে তদন্তের আবেদন করার কারণে (যেমন ধারা ১৯৫-এ বর্ণিত) তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে তা ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা ১৯৬। অভিযোগ পরিচালনা ও প্রতিকার: কোনো মালিক যদি ধারা ১৯৫(১)-এ উল্লিখিত কোনো অসৎ শ্রম আচরণ করেন, অথবা ধারা ১৯৬ক তে বর্ণিত কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে বৈষম্য করেন, তবে মালিককে অবিলম্বে এমন কার্যক্রম বন্ধ করার আদেশ দেওয়া যেতে পারে।

মালিকের কার্যক্রমের কারণে শ্রমিক যদি কোনো আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষতির সম্মুখীন হন, তবে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধারের জন্য মালিককে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য করা যেতে পারে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

১. কর্মস্থলে কার্যক্রমের উপর সীমাবদ্ধতা (কর্মঘণ্টা)

- **সাধারণ নিয়ম:** মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো শ্রমিক কর্মঘণ্টার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
- **ব্যতিক্রম:** এই সীমাবদ্ধতা সিবিএ-এর সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যদি তাদের কার্যক্রম এই আইনের অধীনে আনুষ্ঠানিক দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় (যেমন কমিটির কাজ, আলোচনা, সালিশি), এবং মালিককে সে বিষয়ে অবহিত করা হয়।

২. শ্রমিক ও ইউনিয়নের জন্য মূল নিষেধাজ্ঞাসমূহ শ্রমিক এবং তাদের ইউনিয়নসমূহের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ:

- **ভয়ভীতি বা জবরদস্তি:** কোনো শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করতে, যোগদান না করতে, সদস্যপদ বজায় রাখতে, অথবা ট্রেড ইউনিয়ন বা ইউনিয়ন পদ ত্যাগ করতে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা প্ররোচিত করা।
- **তহবিল প্রদান:** ভয়ভীতি, জবরদস্তি, হুমকি, শারীরিক আঘাত, অথবা ইউটিলিটি সুবিধা (টেলিফোন, পানি বা বিদ্যুতের মতো) বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে কোনো শ্রমিককে ইউনিয়ন চাঁদা প্রদান করতে বা প্রদান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা বা বাধ্য করার চেষ্টা করা।
- **মালিককে বাধ্য করা:** ভয়ভীতি, জবরদস্তি, হুমকি, অবরুদ্ধকরণ, উচ্ছেদ, আক্রমণ, শারীরিক আঘাত, অথবা পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস বা টেলিফোনের মতো ইউটিলিটি সুবিধা বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে কোনো মালিককে নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করতে বা কোনো দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা বা বাধ্য করার চেষ্টা করা।
- **বেআইনি কার্যক্রম:** বেআইনি ধর্মঘট শুরু করা, অব্যাহত রাখা বা উসকানি দেওয়া; ধর্মঘটে বেআইনি অংশগ্রহণ; অথবা ধীরগতিতে কাজ করা।
- **ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম:** ইউনিয়নের লক্ষ্য এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘেরাও (ঘিরে রাখা ও অবরুদ্ধকরণ), পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করা, অথবা সম্পত্তি ধ্বংসের আশ্রয় নেওয়া।

১. সিবিএ নির্বাচনে হস্তক্ষেপ

ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ: কোনো ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অনুচিত প্রভাব, ভয়ভীতি, ছদ্মবেশ ধারণ, অথবা ঘুষের মাধ্যমে সিবিএ নির্বাচনে (ধারা ২০২-এর অধীনে) হস্তক্ষেপ করা অসৎ শ্রম আচরণ হিসেবে গণ্য হবে।

৩.২.৫ অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য সম্পর্কিত মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি

অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য সম্পর্কিত মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি

(Standard Operating Procedures/SOPs)

ধাপ	কার্যক্রম	সময়সীমা
০১. লিখিত অভিযোগ	শ্রমিক কর্তৃক বাংলাদেশ শ্রম আইন বা BLA-এর ধারা ৩১৫ ও ৩১৭-এর অধীনে অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য সম্পর্কে শ্রম অধিদপ্তর বা DOL-এ অভিযোগ দায়ের।	ঘটনার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রমিক কর্তৃক অভিযোগ দায়ের করতে হবে।
০২. যাচাই	i) লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর, DOL যাচাই করবে যে অভিযোগটি অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য বা হস্তক্ষেপ-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না। ii) লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর, DOL যাচাই করবে যে অভিযোগটি অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য বা হস্তক্ষেপ-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না।	i) ০৩ কর্মদিবস

ধাপ	কার্যক্রম	সময়সীমা
	ii) যদি বিষয়গুলো অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্য বা হস্তক্ষেপ-সংক্রান্ত না হয়, তবে অভিযোগটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে।	ii) ০৩ কর্মদিবস
০৩. যোগাযোগ	i) যাচাইয়ের পর, প্রয়োজন হলে DOL অভিযোগটি মালিকের কাছে প্রেরণ করবে এবং তাকে লিখিত জবাব প্রদান করতে বলবে। ii) মালিকের কাছে পত্রটির প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। (ডাকযোগে প্রেরণের সময়সহ) iii) মালিকের লিখিত জবাব। (ডাকযোগে প্রেরণের সময়সহ) iv) পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে DOL-এর সিদ্ধান্ত	i) ০৫ কর্মদিবস ii) ০৫ কর্মদিবস iii) ০৫ কর্মদিবস iv) ০২ কর্মদিবস
০৪. তদন্ত	i) লিখিত জবাব প্রাপ্তির পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব না পাওয়া গেলে DOL ন্যূনতম দুই সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত দল নিয়োগ করবে। ii) তদন্ত শুরু এবং তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে মালিক ও অভিযোগকারী উভয়কে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে। (ডাকযোগে প্রেরণের সময়সহ) iii) তদন্তের অংশ হিসেবে, তদন্ত দল প্রতিষ্ঠান কার্যালয়ে মালিকের ও অভিযোগকারীর সঙ্গে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করবে। উভয় পক্ষকে সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রাসঙ্গিক নথি পত্র ও অন্যান্য তথ্য, সাক্ষীসহ, প্রস্তুত রাখতে বলা হবে। iv) তদন্ত দল প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সংগ্রহ করবে এবং সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ করতে পারে, যা তিনি বা তারা সাক্ষীদের স্বাক্ষর করতে বলবেন। তিনি বা তারা আরও তথ্যও চাইতে পারেন। v) অভিযোগের বিষয়বস্তু সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য স্পষ্ট করা, প্রাপ্ত প্রমাণ পর্যালোচনা করা অথবা সম্ভাব্য সমাধান অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত দল মালিক বা মালিকের প্রতিনিধি এবং	i) ০২ কর্মদিবস
	অভিযোগকারী উভয়কে নিয়ে একটি যৌথ সভার ব্যবস্থাও করতে পারে। যৌথ সভা আহ্বান তদন্ত দলের বিবেচনাধীন থাকবে, যদি না উভয় পক্ষ তা অনুরোধ করে। যৌথ সভার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তদন্ত দল হয়রানি ও ভয়ভীতির মাত্রা বিবেচনায় নেবে। vi) তদন্ত দল পরিশেষে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে, যেখানে কথিত অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সমাধানের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সব ক্ষেত্রে, তদন্ত দল উল্লেখ করবে যে তার বা তাদের বিবেচনায় শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের কোনো লঙ্ঘন ঘটেছে কি না।	ii) ০৬ কর্মদিবস iii) ০৭ কর্মদিবস iv) ০৭ কর্মদিবস

ধাপ	কার্যক্রম	সময়সীমা
০৫. নিষ্পত্তি	i) যদি DOL দেখতে পায় যে কোনো অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য সংঘটিত হয়নি, তবে তদন্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত করে উভয় পক্ষকে তা অবহিত করবে এবং ওই পর্যায়ে মামলাটি সমাপ্ত হবে। তবে, অভিযোগকারী তার অভিযোগ আরও এগিয়ে নিতে স্বাধীন থাকবেন; যেমন, বাংলাদেশ শ্রম আইনের- ধারা ২১৩-এর অধীনে শ্রম আদালতে সরাসরি আবেদন করার মাধ্যমে। (ডাকযোগে প্রেরণের সময়সহ) ii) যদি DOL দেখতে পায় যে অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য সংঘটিত হয়েছে, তবে তদন্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত করে উভয় পক্ষকে তা অবহিত করবে এবং সুপারিশকৃত নিষ্পত্তি বাস্তবায়নের জন্য মালিকের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করবে। iii) যদি মালিক তা মেনে চলেন, এবং অভিযোগকারী লিখিতভাবে তা নিশ্চিত করেন, তবে এই পর্যায়ে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং পক্ষসমূহকে সে অনুযায়ী অবহিত করা হবে। তবে, অভিযোগকারী অথবা মালিক DOL কর্তৃক সুপারিশকৃত নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হলে, তিনি তার অভিযোগ আরও এগিয়ে	i) ০৬ কর্মদিবস
	নিতে স্বাধীন থাকবেন। যেমন, বাংলাদেশ শ্রম আইন-এর ধারা ২১৩-এর অধীনে শ্রম আদালতে সরাসরি আবেদন করার মাধ্যমে। iv) উল্লেখ্য, পদ্ধতির আগের যেকোনো পর্যায়েও মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে বিবেচিত হতে পারে। এটি প্রযোজ্য হবে যদি এবং যত তাড়াতাড়ি মালিক অভিযোগকারীর সন্তুষ্টি অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়টি সমাধান করেন এবং অভিযোগকারী তা লিখিতভাবে নিশ্চিত করেন।	
০৬. নথিভুক্তকরণ	i) DOL নিশ্চিত করবে যে প্রক্রিয়াটির পূর্ণাঙ্গ নথি প্রস্তুত করা হয়েছে। ii) নথিতে অভিযোগ, জবাব, প্রেরিত ও প্রাপ্ত অন্যান্য পত্র, সভার কার্যবিবরণী, সাক্ষীদের বিবৃতি, দাখিলকৃত নথিপত্র এবং প্রাপ্ত বা সংগৃহীত অন্য যেকোনো তথ্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং কোনো নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো হলে তার রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে। iii) এই তথ্য একটি সমন্বিত ডাটাবেস হালনাগাদ করার জন্য ব্যবহার করা হবে।, যেখানে মামলা নিষ্পত্তিতে নেওয়া সময়, আরোপিত প্রতিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। iv) প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ অনলাইন ডাটাবেস হালনাগাদ করা হবে।	ধাপে ধাপে, এটি ফাইলে সংরক্ষণ করা হবে এবং নির্ধারিত রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
০৭. শ্রম আদালতে প্রেরণ	i) যদি DOL দেখতে পায় যে অসৎ শ্রম আচরণ এবং ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্য সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু মালিক DOL কর্তৃক সুপারিশকৃত নিষ্পত্তি যথাসময়ে বাস্তবায়ন করেননি, তবে DOL BLA-এর ধারা ৩১৩(২-বি) এবং ৩১৭(৪-বি)-এর অধীনে শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করবে। ii) এ উদ্দেশ্যে, DOL তার অনুসন্ধান ও সুপারিশসহ কার্যধারার পূর্ণাঙ্গ নথি আদালতে দাখিল করবে।	i) ০৪ কর্মদিবস

৪. কর্মক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তি

একটি স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনশীল কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য একটি স্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া অপরিহার্য। এর প্রধান লক্ষ্য হলো মতানৈক্য ও বিরোধসমূহ কার্যকরভাবে এবং ন্যায্যতার সঙ্গে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা, যাতে বিষয়গুলো আরও জটিল পর্যায়ে না পৌঁছায় এবং কর্মীদের মনোবল বা উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব না ফেলে।

কর্মক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তি:

- শ্রমিক বা শ্রমিকগণ অথবা তাদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিগণ এবং ব্যবস্থাপনা অথবা এর প্রতিনিধি বা তিনিধিগণের মধ্যে আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করে;
- সাধারণত একটি বিধিসম্মত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ধারাবাহিক কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে, যা কোনো যৌথ চুক্তি বা আচরণবিধির (Code of Conduct) অংশ হতে পারে;
- পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থাপনার উচ্চতর স্তর এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে; এবং
- আলোচনা এবং যৌথ দরকষাকষি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এমন একজন সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে করা যেতে পারে, যাকে উভয় পক্ষই উপযুক্ত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে। এই ব্যক্তির দায়িত্বের মধ্যে থাকতে পারে:

- অভিযোগ ও অসন্তোষ শোনা এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত করা;
- মুক্ত যোগাযোগকে উৎসাহিত করা;
- সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াকে সহজতর করা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
- অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা; এবং
- সংঘাত ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সম্পর্কে উভয় পক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা।

যদিও এই তৃতীয় পক্ষ সাধারণত ব্যবস্থাপনা কর্তৃক মনোনীত হয়, তবুও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের পূর্ণ অনুমোদন তাঁর উপর থাকতে হবে এবং তাঁকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে হবে, যাকে বিশ্বাস করা যায়।

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরোধ নিষ্পত্তি করা বিরোধ মীমাংসার একটি উল্লেখযোগ্য উপায়। কারণ এটি পক্ষগুলোকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করে।

৪.১ সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক এবং বিরোধ নিষ্পত্তি

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সম্মানের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। এগুলো একটি স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে উভয় পক্ষই উন্নতি করতে পারে। এই সম্পর্কগুলো বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো একটি শক্তিশালী ও ন্যায্য বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা।

যেকোনো কর্মক্ষেত্রে বিরোধ একটি অনিবার্য বিষয়। মজুরি, কর্মপরিবেশ, অথবা ব্যক্তিগত অভিযোগ নিয়ে মতানৈক্য থেকে এসব বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। একটি সুষ্ঠু বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া কেবল সমস্যা সমাধানের একটি ব্যবস্থা নয়। বরং এটি সুস্থ যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং বিরোধগুলোকে ধর্মঘট বা লক-আউটের মতো বড় ধরনের বিপ্লব রূপ নেওয়া থেকে প্রতিরোধ করার একটি কার্যকর উপকরণ বা হাতিয়ার।

একটি কার্যকর ব্যবস্থা হওয়া উচিত:

- দ্রুত: সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করা উচিত, যাতে সেগুলো জমে থেকে আরও গুরুতর আকার ধারণ না করে।
- ন্যায্য: প্রক্রিয়াটি অবশ্যই নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ হতে হবে, যাতে উভয় পক্ষই অনুভব করে যে তাদের বক্তব্য শোনা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে ন্যায্যসঙ্গত আচরণ করা হয়েছে।
- সহজলভ্য: সকল শ্রমিককে প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং প্রতিশোধমূলক আচরণের ভয় ছাড়াই এটি ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হবে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

যখন কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা একটি কোম্পানির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন এটি শিল্প সম্পর্ক শক্তিশালী করার একটি কার্যকর উপকরণ হিসেবে কাজ করে। এটি একটি সহযোগিতামূলক পদ্ধতির প্রতি অঙ্গীকারের ইঙ্গিত দেয়। যেখানে চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যাসমূহ একসঙ্গে মোকাবিলা করা হয় এবং সংঘাতের পরিবর্তে সংলাপের মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করা হয়। এর ফলে এটি একটি বিশ্বস্ত ও অনুপ্রাণিত কর্মীবাহিনী এবং একটি সহনশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, অভিযোগ পদ্ধতি, যৌথ দরকষাকষি, কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা এবং সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এসবই কার্যকর অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অভিযোগ পদ্ধতি শ্রমিকদের পৃথকভাবে অভিযোগ উত্থাপন এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তির জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ ও পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া প্রদান করে। এই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে নথিভুক্ত, তদন্ত ও ন্যায্য এবং সঙ্গতিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। এর ফলে ছোটখাটো সমস্যা বড় আকার ধারণ করার আগেই তা সমাধান করা সম্ভব হয়।

(অভিযোগ পদ্ধতি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য অধ্যায় ২ দেখুন।)

অন্যদিকে, যৌথ দরকষাকষি হলো ব্যবস্থাপনা ও একটি শ্রমিক সংঘ (ট্রেড ইউনিয়নের) মধ্যে আলোচনার একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের একটি দলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে এবং মজুরি, কর্মপরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধাসহ কর্মসংস্থানের বিভিন্ন শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয়। এটি যৌথ বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কের জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী উপকরণ বা হাতিয়ার।

আবার, কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা এমন একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেয়, যেখানে শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপনা অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসঙ্গে কাজ করে থাকে। সাধারণত যৌথ কমিটি বা যোগাযোগ ফোরামের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমস্যাগুলো আনুষ্ঠানিক বিরোধে পরিণত হওয়ার আগেই চিহ্নিত ও সমাধান করা হয়।

একটি সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিকে একটি একক ও সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে একত্রিত করে। এতে সংঘাতের বিভিন্ন পর্যায়ে তা মোকাবিলার জন্য আনুষ্ঠানিক আলোচনা ও সহকর্মী মধ্যস্থতা থেকে শুরু করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পদ্ধতি ও সালিশি পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়কেই দ্রুত, ন্যায্য ও টেকসই সমাধান খুঁজে পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

৪.২ যৌথ দরকষাকষি এবং বিরোধ নিষ্পত্তি

যৌথ দরকষাকষি হলো মালিক বা মালিকদের একটি দল এবং শ্রমিক সংগঠন বা শ্রমিকদের একটি দলের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক আলোচনার একটি প্রক্রিয়া। এটির উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য কর্মসংস্থানের শর্তাবলিতে পৌঁছানো।

এই প্রক্রিয়া আলোচনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যেখানে ধরে নেওয়া হয় যে:—

- এমন একটি বিরোধপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা আলোচনার করা প্রয়োজন।
- এমন একটি অভিন্ন স্বার্থ বা বিষয় রয়েছে, যা সমঝোতায় বা চুক্তিতে পৌঁছানোর দরকার।

যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন যে বিষয়গুলো তা হলো:

- পক্ষগুলো সংগঠিত হওয়ার জন্য স্বাধীন হওয়া।
- মালিক বা মালিকদের দল দরকষাকষির উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের একটি দলকে স্বীকৃতি দেয়া।
- পক্ষগুলো প্রক্রিয়াটিকে কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা।
- পক্ষগুলোর দরকষাকষি করার সক্ষমতা থাকা।
- আইনি ও রাজনৈতিক পরিবেশ দরকষাকষি প্রক্রিয়ার সহায়তা করে।

যৌথ দরকষাকষির সাধারণ উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী বিধি প্রতিষ্ঠা করা। এসব বিধি বা নিয়মাবলী হতে পারে:

- মৌলিক
- পদ্ধতিগত

মৌলিক বিধি বলতে মজুরি, ভাতা, কর্মঘণ্টা, ছুটি এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসহ কর্মসংস্থানের প্রকৃত শর্তাবলি ও পরিবেশকে বোঝায়।

“পদ্ধতিগত বিধি” বলতে মতানৈক্য ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুসরণীয় নির্ধারিত প্রক্রিয়া, নিয়ম ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বোঝায়। যৌথ দরকষাকষির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- মজুরি এবং কর্মসংস্থানের বা চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণ করা।
- শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা।
- আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ন্যূনতম মানদণ্ডের পরিপূরক হিসেবে কাজ করা।
- শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ করা।
- শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

৪.২.১ যৌথ দরকষাকষি এবং বিরোধ প্রতিরোধ

যৌথ দরকষাকষি কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে বিরোধ প্রতিরোধ করে। শ্রমিকদের প্রভাবিত করে এমন বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার মাধ্যমে চাকরি সংক্রান্ত শর্তাবলি নিয়ে সম্ভাব্য সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়।

মজুরি এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা আলোচনা ও পারস্পরিক সমঝোতা বা চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

মতানৈক্যসমূহ দরকষাকষির আলোচনার টেবিলে তুলে ধরা হয়, যার ফলে পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো যায়।

উদাহরণ:

শ্রমিকরা মাসিক মজুরি ৩০০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধির দাবি করে। মালিক ২৫০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। এখানে একটি মতানৈক্য এবং বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাব্য ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু ক্রম-একত্রীকরণ (ধাপে ধাপে অবস্থান কাছাকাছি আনার) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পক্ষগুলো পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি পরিমাণে পৌঁছায়। শ্রমিকরা তাদের দাবি কমিয়ে ২৭০ মার্কিন ডলার করতে পারে এবং মালিক তার প্রস্তাব বাড়িয়ে ২৬০ মার্কিন ডলার করতে পারেন। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না, ধরা যাক, ২৬৫ মার্কিন ডলারে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো হয়। পক্ষগুলোর আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার এবং সমঝোতায় পৌঁছানোর সদিচ্ছা তাদের সংঘাতকে শ্রম বিরোধে রূপ নেওয়া থেকে প্রতিরোধ করে।

দরকষাকষি প্রক্রিয়ায় আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করার মাধ্যমে বিরোধ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। আলোচনার মধ্যে কথা বলা, শোনা, প্রশ্ন করা এবং সাধারণভাবে তথ্য ও ধারণা বিনিময় ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি সহায়ক হবে:

- অর্থ স্পষ্ট করতে।
- ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে।
- উদ্দেশ্যগুলো স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে।

যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে বিরোধ আরও কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পক্ষগুলো যে বিষয়ে একমত হয় তা যেন:

- স্পষ্ট হয়।
- দ্ব্যর্থহীন বা সন্দেহাতীত হয়।
- ভুল ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে বা ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ না রাখে।

উদাহরণ:

কোনো যৌথ চুক্তিতে যদি বলা হয়, “শ্রমিকরা ১৪ দিনের বেতনসহ বার্ষিক ছুটির অধিকারী”, তাহলে তা স্পষ্ট নয় এবং এর ফলে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে কে শ্রমিক হিসেবে গণ্য হবে, কোন কোন শ্রমিক এই অধিকারভুক্ত হবে, এবং ১৪ দিন বলতে কর্মদিবস বোঝাবে নাকি বর্ষপঞ্জির দিন বোঝাবে।

৪.২.২ যৌথ দরকষাকষি এবং বিরোধ নিষ্পত্তি

যৌথ দরকষাকষির প্রক্রিয়া পক্ষগুলোকে তাদের চুক্তির অধীন উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সক্ষম করে তোলে। যেহেতু এটি পক্ষগুলোর নিজেদের চুক্তি, তাই কেবল কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের উপর নির্ভর না করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করা তাদের স্বার্থের মধ্যেই পড়ে।

চুক্তির বিদ্যমান বিধানসমূহের ব্যাখ্যা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

উদাহরণ:

কোনো যৌথ চুক্তির অধীনে শ্রমিকরা ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে বেতনসহ ছুটির অধিকারী। কোন শ্রমিকরা? ধর্মীয় উৎসবের দিন বলতে কী বোঝায়? কোন কোন ধর্মের উৎসব?

উদাহরণ:

কোনো যৌথ চুক্তির অধীনে শ্রমিকরা চাকরির প্রতিটি বছরের জন্য অতিরিক্ত এক দিনের বার্ষিক ছুটির অধিকারী। এক বছর এবং ১১ মাস চাকরি করেছেন এমন একজন শ্রমিকের অবস্থান কী হবে? তিনি কি অতিরিক্ত এক দিনের নাকি দুই দিনের ছুটির অধিকারী হবেন? যদি এ বিষয়টি পক্ষগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাহলে “চাকরির প্রতিটি বছর” বলতে প্রতিটি পূর্ণ বছর বোঝাবে, নাকি বছরের কোনো অংশও বোঝাবে এ বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য আলোচনা ও দরকষাকষির মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। যদি পক্ষগুলো একমত হতে না পারে, তাহলে তারা তাদের যৌথ চুক্তিতে বর্ণিত বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

উপরের উদাহরণগুলোতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ যৌথ চুক্তির ধারা বা অনুচ্ছেদসমূহ আরও সতর্কতার সঙ্গে প্রণয়ন করা হলে প্রতিরোধ করা যেত।

বিদ্যমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন বিধান নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

উদাহরণ:

নতুন যৌথ চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় শ্রমিকরা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ভিত্তিতে ২০% মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে। মালিক পরিশোধ সক্ষমতার ভিত্তিতে ৬% মজুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, কারণ কোনো পক্ষই নিজের অবস্থান পরিবর্তনে প্রস্তুত নয়। শ্রম বিরোধ ঘোষণা করা হয় এবং শ্রমিকরা শিল্প কর্মসূচি গ্রহণ করে।

যৌথ চুক্তিতে সাধারণত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একগুচ্ছ কার্যপদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেখানে নিম্নলিখিত ধাপগুলো থাকে:

- অচলাবস্থা নিরসনের জন্য দুই পক্ষের মধ্যে দরকষাকষি;
- দরকষাকষির মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে, সমঝোতা বা মধ্যস্থতার জন্য একজন স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ করা;
- সমঝোতা ব্যর্থ হলে, পক্ষগুলোকে পুনরায় দরকষাকষিতে ফিরে যেতে হবে, অথবা বিকল্পভাবে, স্বেচ্ছায় বিরোধটি সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে সম্মত হতে হয়। সালিশকারী যৌথ চুক্তির বিধান অনুযায়ী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। সালিশকারীর এমন সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, যা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক।

৪.৩ কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি

বিরোধ নিষ্পত্তির একটি ব্যবস্থা হিসেবে কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা প্রাথমিক পর্যায়ে বিরোধ প্রতিরোধের গুরুত্ব এবং মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে আস্থা ও পারস্পরিক সম্মানের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা বলতে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা বোঝায়। এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, যাতে শ্রমিক এবং তাদের ব্যবস্থাপকরা পারস্পরিক সুবিধার জন্য একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে:

- তথ্য বিনিময় করা;
- কথা বলা;
- শোনা;
- আলোচনা করা;
- দরকষাকষি করা; এবং
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কার্যকর কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠানের ভেতরে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাতে ইতিবাচক যোগাযোগ সম্ভব হয়। এ ধরনের ব্যবস্থা ও যোগাযোগ:

- অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং সেগুলোকে বড় ধরনের সংঘাতে রূপ নেওয়া থেকে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে বিরোধ প্রতিরোধ করতে পারে;
- অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা মোকাবিলা করার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে পারে;
- কর্মপরিবেশ ও কর্মপরিস্থিতি উন্নত করতে পারে;
- শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা উন্নত করতে পারে;
- শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে;
- সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান উন্নত করতে পারে;
- অভিন্ন স্বার্থকে উৎসাহিত করতে পারে;
- অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রেরণা বৃদ্ধি করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার একটি কার্যকর ব্যবস্থা:

- (ক) যোগাযোগের প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের প্রতি প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার নির্দেশ করে। এসব পদ্ধতিগত সুবিধা সহজে পরিমাপযোগ্য নয়, তবে ক্ষমতা ভাগাভাগির সদিচ্ছার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।
- (খ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার উন্নতি এবং পণ্যের বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে মুনাফা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত কর্মসম্পাদনে অবদান রাখে। এসব কর্মসম্পাদন-সংক্রান্ত সুবিধা পরিমাপযোগ্য এবং কোনো অনিচ্ছুক মালিকের জন্য একটি শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতার একটি কার্যকর ব্যবস্থা থেকে যে উল্লেখযোগ্য সুবিধা অর্জন করা যায়। এরই আলোকে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) “প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে পরামর্শ ও সহযোগিতা সম্পর্কিত সুপারিশ, ১৯৫২ (নং ৯৪)” কর্মক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কার্যকর পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করে।

সুপারিশ নং ৯৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, পক্ষগুলোর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এবং পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য সংস্থা বা কমিটি প্রতিষ্ঠাকারী আইন বা বিধিমালার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা সহজতর করা যেতে পারে।

কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

স্বেচ্ছামূলক প্রক্রিয়া: কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা একটি স্বেচ্ছামূলক প্রক্রিয়া। তবে যোগাযোগের কিছু ফোরাম আইন দ্বারা আবশ্যিক হতে পারে। যেমন কর্মপরিষদ, যৌথ পরামর্শমূলক সংস্থা, অথবা অন্যান্য শ্রমিক-ব্যবস্থাপক কমিটি গঠন ও পরিচালনা। এমন সংস্থা বা কমিটি গঠন আইন দ্বারা আবশ্যিক হলেও কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা সফলভাবে কার্যকর করতে হলে উভয় পক্ষেরই একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে।

দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়া: কর্মক্ষেত্রের সহযোগিতা একটি দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়া। এতে ব্যবস্থাপক এবং তাদের শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে কোনো সরকার বা তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততা থাকে না, যদি না মালিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরামর্শের জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের সংস্থার সহায়তা চান।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া: যদিও কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আইন দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে আবশ্যিক হতে পারে (যেমন অংশগ্রহণ কমিটি, নিরাপত্তা কমিটি) তবুও পারস্পরিক যোগাযোগের প্রকৃত প্রক্রিয়াগুলো পক্ষগুলো নিজেরাই নির্ধারণ করে।

ট্রেড ইউনিয়নের সম্পৃক্ততা: কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নবিহীন উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানেই থাকতে পারে। যেখানে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যমান, সেখানে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ এবং এসব উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পৃক্ততাকে বিচ্ছিন্ন বা প্রতিস্থাপনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই, সেখানেও শ্রমিকরা প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে ফলপ্রসূভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

নমনীয়তা: কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকদের নিজস্ব প্রক্রিয়াকে এবং এটি তাদের পারস্পরিক যোগাযোগের আলোচ্যসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুযোগ প্রদান করে। ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকরা পারস্পরিকভাবে নির্ধারিত যেকোনো বিষয়ে নিজেদের সুবিধামতো সময়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

সদিচ্ছা: কর্মক্ষেত্রে কার্যকর সহযোগিতার জন্য শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্ট উভয়েরই তথ্য বিনিময়, কার্যকর যোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত পরিচয় বা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে আলোচ্য বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়ার সদিচ্ছা থাকা প্রয়োজন।

সক্ষমতা: কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের কোনো নির্দিষ্ট বা আনুষ্ঠানিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। তবে এতে তথ্য গ্রহণ ও অনুধাবন করার সক্ষমতা, অন্যরা যা বলছে তা শোনার সক্ষমতা, সমস্যা চিহ্নিত করার সক্ষমতা এবং সাধারণভাবে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক ব্যক্তিগত গুণাবলি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়। যার মধ্যে সততা, সৌজন্য এবং সম্মান অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা হলো মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার একটি সক্রিয় পদ্ধতি, যেখানে সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আস্থা ও উন্মুক্ত যোগাযোগের পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বিরোধ নিষ্পত্তির একটি শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক উপকরণ বা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

এই পদ্ধতির আওতায় সাধারণত মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কার্যকর পরামর্শ, যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যৌথ কমিটি, যোগাযোগ ফোরাম বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানে ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিকরা অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। এসব প্ল্যাটফর্ম উভয় পক্ষকে সুযোগ দেয়:

- **সম্ভাব্য সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করতে:** কর্মক্ষেত্রে উদ্বেগসমূহ নিয়মিত আলোচনা করার মাধ্যমে তারা সমস্যাগুলো আনুষ্ঠানিক বিরোধে রূপ নেওয়ার আগেই মোকাবিলা করতে পারে।
- **যৌথ সমাধান তৈরি করতে:** সহযোগিতা যৌথভাবে সমস্যা সমাধানকে উৎসাহিত করে, যার ফলে এমন সমাধান তৈরি হয় যা সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- **পারস্পরিক আস্থা গড়ে তুলতে:** অভিন্ন স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করা সম্পর্ককে শক্তিশালী করে এবং মতানৈক্য দেখা দিলে তা মোকাবিলা করা সহজ করে।

যখন কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির মূল অংশ হয়ে ওঠে, তখন এটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ এবং শিল্প বিরোধের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে। কোন বিষয়ে বিরোধকে জয়-পরাজয়ের লড়াই হিসেবে না দেখে, সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। ফলে আরও টেকসই ও ইতিবাচক সমাধান পাওয়া সম্ভব হয়।

8.8 সমন্বিত বিরোধ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (আইসিএমএস)

সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (আইসিএমএস বা ICMS) হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক পদ্ধতি। প্রচলিত অভিযোগ পদ্ধতির মতো একক, আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর না করে, সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা সংঘাত মোকাবিলার জন্য অনানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক পর্যন্ত বিভিন্ন বিকল্প প্রদান করে। এটি একটি সক্রিয় ব্যবস্থা, যা প্রাথমিক পর্যায়ে, দক্ষতার সঙ্গে এবং সবচেয়ে উপযুক্ত স্তরে সংঘাত মোকাবিলার জন্য প্রণীত। এর লক্ষ্য হলো “সব ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি” ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্টকে তাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা।

এই ব্যবস্থার মূলনীতি হলো-প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য একই ধরনের কোনো একক বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা কার্যকর ও উপযুক্ত হতে পারে না। এটি একটি “বিরোধ নিরসন ব্যবস্থা নকশা” তৈরি করে। যেখানে বিভিন্ন পথ বা পদ্ধতি থাকে এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকরা তাদের নির্দিষ্ট সংঘাতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন। এসব উপকরণ অনানুষ্ঠানিক, স্বল্পব্যয়ী বিকল্প থেকে শুরু করে আরও আনুষ্ঠানিক ও বাধ্যতামূলক পদ্ধতি পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে:

- **অনানুষ্ঠানিক উপকরণ:** এর মধ্যে উন্মুক্ত-দ্বার নীতি, সহকর্মী মধ্যস্থতা, পরামর্শমূলক সহায়তা এবং সহায়তাপ্রাপ্ত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব পদ্ধতিতে দ্রুত ও গোপনীয়ভাবে বিরোধ সমাধান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি:** অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সমাধান না হলে বা আরও গুরুতর বিষয়ের ক্ষেত্রে, এই ব্যবস্থার আওতায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এতে আনুষ্ঠানিক তদন্ত ও অভ্যন্তরীণ সালিশির সুযোগ থাকে। সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (আইসিএমএস বা ICMS) প্রায়ই একজন কেন্দ্রীয় ন্যায়পাল অথবা সংঘাত নিষ্পত্তি কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা শ্রমিকদের জন্য একটি গোপনীয় সহায়ক উৎস হিসেবে কাজ করে। এটি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে এবং শ্রমিকদের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন পদ্ধতি একীভূত করা এবং প্রাথমিক হস্তক্ষেপের সংস্কৃতি উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা আরও দক্ষ ও কার্যকরভাবে সংঘাত নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। সেইসাথে এটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক সুস্থতা ও স্থিতিশীলতা শক্তিশালী করে।

সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বাস্তব উদাহরণ -

সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা করপোরেশন থেকে শুরু করে সরকারি সংস্থা পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ:

- **ন্যায়পালের কার্যালয়:** অনেক বড় করপোরেশন বা প্রতিষ্ঠানে ন্যায়পালের কার্যালয় থাকে। এটি শ্রমিকদের জন্য একটি নিরপেক্ষ ও গোপনীয় সহায়তার মাধ্যম। যেখানে তারা প্রতিশোধমূলক আচরণের আশঙ্কা ছাড়াই কর্মক্ষেত্রের সংঘাত নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। ন্যায়পাল পরামর্শ দিতে, যোগাযোগ সহজতর করতে এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া অনুসরণে সহায়তা করতে পারেন।
- **সহকর্মী মধ্যস্থতা কর্মসূচি:** কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত শ্রমিকরা সহকর্মী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন, যাতে সহকর্মীদের মধ্যে ক্ষুদ্র আন্তঃব্যক্তিক সংঘাত নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা যায়। এটি একটি অনানুষ্ঠানিক, স্বেচ্ছামূলক প্রক্রিয়া, যা পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা এবং কর্মসম্পর্ক সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়।
- **বহু-ধাপের অভিযোগ এবং সমঝোতা বা মধ্যস্থতা:** একটি প্রচলিত সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পদ্ধতি থাকতে পারে, তবে এর সঙ্গে সমঝোতা বা মধ্যস্থতার একটি অতিরিক্ত ধাপ যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ- কোনো বিরোধ তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা না গেলে, তা আনুষ্ঠানিক ও বাধ্যতামূলক সালিশিতে যাওয়ার আগে একজন সমঝোতাকারী বা মধ্যস্থতাকারীর কাছে পাঠানো যেতে পারে। এতে পক্ষগুলো আরও মুখোমুখি সংঘাতপূর্ণ প্রক্রিয়ায় যাওয়ার আগে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তির সুযোগ পায়।
- **অভ্যন্তরীণ সালিশি:** কিছু কোম্পানি বাহ্যিক মামলা-মোকদ্দমার বিকল্প হিসেবে অভ্যন্তরীণ সালিশির সুযোগ দেয়। এতে একজন প্রশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সালিশিকারী বিরোধ শুনানি করে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, যা আদালতে যাওয়ার তুলনায় দ্রুত এবং কম ব্যয়বহুল হতে পারে।

কোনো প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (আইসিএমএস/ICMS) বাস্তবে কার্যকর থাকার একটি বাস্তব উদাহরণ প্যান আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থা (Pan American Health Organization/PAHO) ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্যান আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সংঘাত মোকাবিলায় একটি সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমন্বিত সংঘাত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৫. মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া

আলোচনা ব্যর্থ যাওয়ার পর বিরোধ নিষ্পত্তির পরবর্তী ধাপ হিসেবে একজন স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মধ্যস্থতার প্রস্তাব করা হয়। মধ্যস্থতা আলোচনা প্রক্রিয়ার একটি সম্প্রসারিত রূপ, যেখানে মধ্যস্থতাকারীর বিরোধের ফলাফল নির্ধারণ করার কোনো ক্ষমতা থাকে না। মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলোকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে সহায়তা করেন। তবে তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পক্ষগুলোর হাতেই রয়েছে।

যৌথ চুক্তির বিধান অনুযায়ী, মধ্যস্থতা বেসরকারি খাতের সমঝোতাকারী বা মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারা অথবা কোনো সরকারি বিভাগের অধীনে কর্মরত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সব ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়াটি একই ধরনের হয়ে থাকে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী তার জ্ঞান, দক্ষতা এবং কৌশল ব্যবহার করে বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোকে তাদের মতপার্থক্য নিরসনে সহায়তা করেন। বেসরকারি ও সরকারি মধ্যস্থতার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো বিরোধে জড়িত পক্ষগুলোর ব্যয় বহনের দায়িত্ব। সরকার-অর্থায়িত মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া বিনামূল্যে হলেও, বেসরকারি মধ্যস্থতাকারীদের পারিশ্রমিক বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোকে দিতে হয়, যদি না সরকার প্রক্রিয়াটিতে ভর্তুকি প্রদান করে।

৫.১ মধ্যস্থতার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

মধ্যস্থতা মূলত শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া। কিছু দেশে “সমঝোতা” এবং “মধ্যস্থতা” শব্দ দুটি আইনগতভাবে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আবার অন্য কিছু দেশে এদের মধ্যে কোনো আইনগত সংজ্ঞা বা পার্থক্য নেই। এমনকি যেখানে দুটি শব্দই আইনগতভাবে সংজ্ঞায়িত, সেখানেও ভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভিন্ন চর্চা বিদ্যমান।

মধ্যস্থত প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারীর ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক বিষয় প্রযোজ্য:

- এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত, রায় বা আরোপ করার কোনো ক্ষমতা মধ্যস্থতাকারীর নেই।
- কোন বিষয়ে পক্ষগুলো সম্মত হবে, সে বিষয়ে পক্ষগুলোকে নির্দেশ দেওয়ার কোনো ভূমিকা মধ্যস্থতাকারীর নেই।
- আইনগত পরামর্শ বা আইনগত ব্যাখ্যা প্রদানের কোনো দায়িত্ব মধ্যস্থতাকারীর নেই।

মধ্যস্থতা হলো বিরোধ নিষ্পত্তির এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ মধ্যস্থতাকারী, পক্ষগুলোকে কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে অথবা সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করেন। মধ্যস্থতাকারী সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করেন। তিনি পক্ষসমূহকে একত্রিত করেন এবং নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তবে তিনি সমাধানের প্রস্তাব দেন না।

মধ্যস্থতা সালিশি থেকে ভিন্ন। সালিশিতে সালিশকারী উভয় পক্ষের যুক্তি বিবেচনা করেন এবং এরপর এমন একটি সিদ্ধান্ত দেন, যা বিরোধের পক্ষগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক।

স্বৈচ্ছামূলক মধ্যস্থতা এবং বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে:

- কিছু দেশে আইন বিরোধে জড়িত পক্ষগুলোকে তাদের বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপন করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়।

স্বৈচ্ছামূলক মধ্যস্থতার পেছনের যুক্তি হলো, পক্ষগুলো যদি বিশ্বাস না করে যে এটি তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির উপযুক্ত উপায়, তাহলে মধ্যস্থতার চেষ্টা করার কোনো অর্থ নেই।

- অন্য কিছু দেশে মধ্যস্থতা বাধ্যতামূলক। এর অর্থ এই নয় যে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার ফল অবশ্যই একটি চুক্তি হতে হবে। বরং এর অর্থ হলো প্রক্রিয়ার কিছু ধাপ বাধ্যতামূলক। যেমন-আমন্ত্রণ জানানো হলে মধ্যস্থতা সভায় উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা।

বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতার পেছনের যুক্তি হলো, বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংঘাতমুখী পদ্ধতির পরিবর্তে সহযোগিতামূলক পদ্ধতির সুবিধা সম্পর্কে পক্ষগুলোকে সচেতন করা প্রয়োজন।

এর সবচেয়ে সহজ রূপে, মধ্যস্থতাকে একজন স্বাধীন, নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় দরকষাকষি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সমঝোতা বা মধ্যস্থতাকে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছে:

মধ্যস্থতা স্বেচ্ছামূলক অথবা বাধ্যতামূলক হতে পারে। এটি স্বেচ্ছামূলক হয় যখন পক্ষগুলো ইচ্ছা করলে এটি গ্রহণ করতে পারে, অথবা না-ও করতে পারে। এটি তখনও স্বেচ্ছামূলক হিসেবে বিবেচিত হয়, যখন সরকার বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বাইরে, পারস্পরিকভাবে নির্বাচিত বেসরকারি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে, আইন অনুযায়ী সমঝোতার ব্যবহার গ্রহণ বা শুরু করার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

শ্রম বিরোধের পক্ষগুলো যখন মধ্যস্থতার আশ্রয় নিতে বাধ্য থাকে, তখন মধ্যস্থতা বাধ্যতামূলক হয়। বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা শ্রম বিরোধে বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোকে আলোচনার টেবিলে একত্রিত করার একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই যেখানে শ্রম সম্পর্ক ব্যবস্থা সুসংগঠিত নয় এবং যেখানে পক্ষগুলো একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করতে অভ্যস্ত নয়, সেখানে বাধ্যতামূলক পদ্ধতি অগ্রাধিকার পেতে পারে। যেসব ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক সালিশি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেসব ব্যবস্থায়ও মধ্যস্থতা প্রায়ই বাধ্যতামূলক হয়।

স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধে মধ্যস্থতার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা রাখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শিল্প বিরোধকে কেন্দ্র করে কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ সীমিত করা এবং সম্ভব হলে তা প্রতিরোধ করা। মধ্যস্থতা এবং শিল্প কর্মসূচির মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।

যেমন, শিল্প কর্মসূচি গ্রহণের আগে পক্ষগুলোকে মধ্যস্থতার কর্তৃপক্ষকে অগ্রিম নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। আবার, মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা না করে সরাসরি শিল্প কর্মসূচি গ্রহণকে বেআইনি ঘোষণা করা হতে পারে।

মধ্যস্থতায় অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা নিম্নলিখিত যেকোনো একটি বিষয়ের উপর, অথবা সেগুলোর সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে হতে পারে:

- বিরোধ সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা;
- কর্তৃপক্ষের কাছে বিরোধের বিষয়ে প্রতিবেদন করা বাধ্যতামূলক করা হতে পারে। এর ফলে কর্তৃপক্ষ সমঝোতা বা মধ্যস্থতা কার্যক্রম শুরু করতে এবং প্রয়োজনে এসব কার্যক্রমে পক্ষগুলোর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারে। সমঝোতা বা মধ্যস্থতা পরিচালনার জন্য আহ্বান করা তৃতীয় পক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা;
- মধ্যস্থতায় অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা;
- মধ্যস্থতা পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া এবং তা সম্পন্ন করার আগে ধর্মঘট ও লক-আউটের নিষেধাজ্ঞা;
- সমঝোতা বা মধ্যস্থতার সময় সম্পাদিত চুক্তি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা;
- অধিকার-সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে, আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বিরোধটি বিবেচনার আগে সমঝোতা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা।

যেসব ব্যবস্থায় মধ্যস্থতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়, সেসব ব্যবস্থায় এই বাধ্যবাধকতা অমান্য করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও থাকে। কোনো পক্ষ যথার্থ কারণ ছাড়া উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে জরিমানার দায়ে পড়তে পারে। কোনো পক্ষ উপস্থিত না হলে বিরোধটি অনিষ্পন্ন ঘোষণা হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এর ফলে অপর পক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তির পরিবর্তে শিল্প কর্মসূচি গ্রহণের পথে অগ্রসর হতে পারে অথবা, বিরোধ নিষ্পত্তিকারী সংস্থা উপস্থিত হতে ব্যর্থ পক্ষকে খরচ বহনের নির্দেশ দিতে পারে। যেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, সেখানে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হওয়াকে অসৎ শ্রম আচরণ হিসেবেও গণ্য করা হতে পারে।

এ বিষয়ে প্রচলিত একটি মত হলো, মধ্যস্থতার কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করার তেমন উদ্দেশ্য নেই। কারণ কোনো এক পক্ষ অনমনীয় থাকলে মধ্যস্থতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা খুব কম থাকে। অন্যদিকে, কেউ কেউ মনে করেন যে শিল্প সংঘাত এড়াতে সব ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত এবং সে কারণে বিরোধের পক্ষগুলোকে এসব পদ্ধতিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করা উচিত। তবে প্রক্রিয়ার শেষে কোনো মধ্যস্থতায় পৌঁছানো অবশ্যই পক্ষগুলোর স্বেচ্ছাধীন হতে হবে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

মধ্যস্থতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৯৫২ সালের সুপারিশ নং ৯২ এ নিম্নলিখিত নীতিসমূহকে উৎসাহিত করে:

- মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ প্রতিরোধ ও এর নিষ্পত্তিতে সহায়তার জন্য স্বেচ্ছামূলক মধ্যস্থতা ব্যবস্থা সহজলভ্য করা উচিত;
- সামাজিক অংশীদারদের দ্বারা স্বেচ্ছামূলক মধ্যস্থতা ব্যবস্থা গঠিত হলে, তাতে মালিক ও শ্রমিকদের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত;
- মধ্যস্থতা বিনামূল্যে এবং দ্রুত হওয়া উচিত;
- বিরোধের যেকোনো পক্ষ অথবা মধ্যস্থতা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমঝোতা শুরু করার সুযোগ থাকা উচিত;
- সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সম্মতিতে কোনো বিরোধ মধ্যস্থতায় উপস্থাপিত হলে, সমঝোতা চলাকালে পক্ষগুলোকে ধর্মঘট ও লক-আউট থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা উচিত;
- মধ্যস্থতার সময় সম্পাদিত চুক্তি লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা উচিত এবং তা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।^{১৪}

মধ্যস্থতার মূল উপাদানসমূহ হলো:

- মধ্যস্থতা একটি শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া।
- মধ্যস্থতা দরকষাকষি প্রক্রিয়ার সম্প্রসারিত রূপ।
- মধ্যস্থতা হলো সহায়তাপ্রাপ্ত দরকষাকষি।
- দরকষাকষিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে সমঝোতা শুরু হয়।
- সমঝোতা হলো বিরোধে একটি পদ্ধতিগত হস্তক্ষেপ।
- সমঝোতা আইন প্রয়োগ নয়; এটি কেবল পক্ষগুলোকে তাদের বিরোধ সমাধানে সহায়তা করার একটি উপায়।
- মধ্যস্থতার ফলাফল পক্ষগুলোর নিজস্ব।
- মধ্যস্থতা একটি নমনীয় প্রক্রিয়া।
- মধ্যস্থতা একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়া।
- মধ্যস্থতা সাধারণত গোপনীয় হয়।

৫.২ মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

মধ্যস্থতা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে বিরোধে জড়িত পক্ষগুলো তাদের আলোচনায় সহায়তা করার জন্য একজন স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের সহায়তা গ্রহণ করে। মধ্যস্থতাকারীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় যে তিনি সম্পৃক্ততার জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করবেন এবং আলোচনাকে এমনভাবে পরিচালনা করবেন, যাতে মতানৈক্যের কারণ হওয়া বিষয়গুলো যুক্তিসঙ্গত ও সুশৃঙ্খলভাবে বিবেচনা করা যায়। এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো পক্ষগুলোকে বিভিন্ন সম্ভাব্য বিকল্প বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়া, যাতে তারা পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে পারে।

মধ্যস্থতাকারীর বহু ভূমিকা ও কার্যাবলি রয়েছে:

- **আলোচনার সমন্বয়কারী:** মধ্যস্থতাকারীকে পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনা সমন্বয় করতে এবং আলোচনাকে মূল বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে। আবেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে পক্ষগুলোকে আলোচ্য বিষয়ে মনোযোগী রাখা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হতে পারে।

^{১৪} আর ০৯২ - স্বেচ্ছামূলক সমঝোতা ও সালিশি সুপারিশ, ১৯৫১ (নং ৯২)/R092 - Voluntary Conciliation and Arbitration Recommendation, 1951 (No. 92)

- **পক্ষগুলোর জন্য চাপমুক্তভাবে কথা বলার নিরাপদ সুযোগ:** যখন পক্ষগুলো ক্ষোভ প্রকাশ করতে চায় অথবা কারও প্রতি তাদের হতাশা প্রকাশ করতে চায়, তখন মধ্যস্থতাকারীই তার লক্ষ্য হতে পারেন। সেইসাথে এটি আলোচনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও দূর করতে সহায়তা করতে পারে।
- **পক্ষগুলোর মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন:** এটি মধ্যস্থতাকারীর কাজের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, যার জন্য কার্যকরী যোগাযোগ দক্ষতা অপরিহার্য। পৃথক বৈঠক ব্যবহার এবং ভাষা পরিমার্জনের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলোকে ব্যক্তির পরিবর্তে সমস্যার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সহায়তা করতে পারেন।
- **প্রভাবক:** পক্ষগুলোর সঙ্গে তাঁর প্রভাব, অর্জিত আস্থা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যবহার করে মধ্যস্থতাকারী তাদের কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখতে অথবা কোনো নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজি করতে পারেন।
- **প্রশ্নকারী বা অনুসন্ধানকারী:** মধ্যস্থতাকারী কোনো অধিকার বা দাবি ক্ষুণ্ণ না করে প্রস্তাবের প্রতি পক্ষগুলোর প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে পারেন একইসাথে কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয়েই সম্ভাব্য সমাধান অনুসন্ধানের জন্য তাদের একটি নিরাপদ পরিবেশ দিতে পারেন।
- **তথ্য ও ধারণা সরবরাহকারী:** মধ্যস্থতাকারী পূর্বে সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলো বা কোনো নির্দিষ্ট শিল্পখাতে প্রচলিত বর্তমান চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে পক্ষগুলোকে তথ্য দিতে পারেন। মধ্যস্থতাকারী সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন ধারণা দিতে পারেন এবং সমস্যাটিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন।
- **মতামত যাচাইয়ের মাধ্যম বা বাস্তবতা পরীক্ষক:** মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলোকে তাদের অবস্থান বাস্তবতার আলোকে যাচাই করতে সহায়তা করতে পারেন অথবা সমাধানের জন্য তারা যে ধারণাগুলো বিবেচনা করছেন, তা অন্য পক্ষকে না জানিয়েই মধ্যস্থতাকারীর কাছে প্রকাশ বা যাচাই করার সুযোগ দিতে পারেন।
- **রক্ষক বা নিরাপদ আশ্রয়:** মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলোকে তাদের চূড়ান্ত অবস্থান গোপন রেখে তা তাঁর কাছে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে পারেন। এটি মধ্যস্থতাকারীকে একটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে পক্ষগুলোর মধ্যে কতটা ব্যবধান রয়েছে এবং একটি চুক্তিতে বা মধ্যস্থতায় পৌঁছানোর জন্য তারা অতিরিক্ত দূরে আছে কি না। যেহেতু এটি গোপনীয়ভাবে ঘটে, তাই পক্ষগুলো মধ্যস্থতাকারী কাছে খোলামেলা হতে পারে। তবে এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন আস্থা বিদ্যমান থাকে।
- **মতামত, অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়ক:** মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলোকে বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে নিজেদের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করতে এবং সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। কখনও কখনও ধারণাগুলো থাকে, কিন্তু পক্ষগুলোর সেগুলোকে নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস বা অভিজ্ঞতা থাকে না। এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী তাদের সহায়তা করতে পারেন।
- **সহানুভূতিশীল শ্রোতা:** কখনও কখনও পক্ষগুলোর তাদের হতাশা ও উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য একজন মনোযোগী ও সহানুভূতিশীল শ্রোতার প্রয়োজন হয়। এটি শুধু আস্থা গড়ে তুলতেই সহায়তা করে না, বরং তারা যখন অনুভব করে যে তাদের কথা শোনা হয়েছে, তখন বিকল্প সমাধান বিবেচনার দিকেও তাদের এগিয়ে নিতে পারে।
- **ভাষা প্রণেতা:** মধ্যস্থতাকারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা বা ভূমিকার একটি হলো পক্ষগুলোর মধ্যস্থতাকে স্পষ্টভাবে এবং এমন ভাষায় লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা। এটি সব পক্ষ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। মূল বিষয়গুলো ধারণ করা এবং ব্যবহৃত ভাষা থেকে যেকোনো পক্ষপাত বা আবেগ দূর করার সক্ষমতা একটি অপরিহার্য দক্ষতা। এক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে এগিয়ে নিতে পারে, যা তার অন্যান্য অনেক ভূমিকার মাধ্যমে সম্ভব নাও হতে পারে।
- **দিকনির্দেশক:** মধ্যস্থতাকারী প্রশ্ন করার মাধ্যমে পক্ষগুলোকে তাদের অবস্থান মূল্যায়নে সহায়তা করতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ মূল্যায়নে সহায়তা করতে পারেন। তিনি দিকনির্দেশনা দিতে পারেন কখনও পূর্ববর্তী মামলার ফলাফলের ভিত্তিতে, আবার কখনও কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাবে অন্য পক্ষ কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, সে সম্পর্কে মধ্যস্থতাকারীর ধারণার ভিত্তিতে। এই ভূমিকায় গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

- **সমাধানের পক্ষে সহায়ক:** মধ্যস্থতাকারীর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হলো কখন কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আর এগোবে না তা বুঝতে পারা। এ অবস্থায় মধ্যস্থতাকারীকে বিষয়টি অন্য পক্ষের কাছে তুলে ধরতে হবে এবং চূড়ান্ত অবস্থানটির যৌক্তিকতা ও বিকল্প কোনো ফোরামে যাওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করতে পক্ষগুলোকে সহায়তা করতে হবে। প্রয়োজনে তিনি এক পক্ষকে স্পষ্ট করে জানাতে পারেন যে, অন্য পক্ষের প্রস্তাবটি চূড়ান্ত এবং এটিই তার সর্বোত্তম প্রস্তাব।
- **পক্ষগুলোর মান রক্ষাকারী:** কখনো কখনো মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে এক বা উভয় পক্ষই নিজেদের মানসম্মান বজায় রাখতে চায় এবং সহজেই কোনো প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে—এমন ধারণা তৈরি করতে চায় না। মধ্যস্থতাকারী এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপায় খুঁজে বের করতে পারেন। তিনি হয় পক্ষগুলোকে এমন ভাষায় চুক্তি প্রণয়নে সহায়তা করতে পারেন, যা উভয় পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, অথবা নিজেই এমন একটি প্রস্তাব দিতে পারেন, যাতে কোনো পক্ষেরই মনে না হয় যে তারা নিজের অবস্থান থেকে ছাড় দিচ্ছে বা সহজে কোনো কিছু মেনে নিচ্ছে।
- **প্রশিক্ষক:** যারা প্রক্রিয়াটির সঙ্গে কম পরিচিত অথবা এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, তাদের জন্য মধ্যস্থতাকারী প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। তিনি এক বা উভয় পক্ষকে ধাপে ধাপে প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত, রায় বা আরোপ করার কোনো ক্ষমতা মধ্যস্থতাকারীর নেই। কোন বিষয়ে পক্ষগুলো সম্মত হবে, সে বিষয়ে পক্ষগুলোকে নির্দেশ দেওয়ার কোনো ভূমিকা মধ্যস্থতাকারীর নেই। আইনগত পরামর্শ বা আইনগত ব্যাখ্যা প্রদানের কোনো দায়িত্ব মধ্যস্থতাকারীর নেই।

মধ্যস্থতার ধরনসমূহ:

- এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মধ্যস্থতা প্রক্রিয়াজুড়ে মধ্যস্থতাকারীরা পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের ধরনগুলো সাধারণত তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়:
- (১) **সহায়তামূলক:** এখানে তৃতীয় পক্ষ (মধ্যস্থতাকারী) পক্ষগুলোকে পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছাতে সহায়তা করার জন্য আলোচনার প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেন। তিনি কোনো বিকল্প ফোরামে সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সুপারিশ, পরামর্শ বা পূর্বাভাস দেন না। এ ধরনের ভূমিকা পালনের জন্য বিরোধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক নয়।
- (২) **মূল্যায়নমূলক:** এখানে তৃতীয় পক্ষ (মধ্যস্থতাকারী) পক্ষগুলোর অবস্থানের দুর্বলতা নির্দেশ করে এবং বিরোধ নিষ্পত্তির কোনো বিকল্প ফোরাম, যেমন-দেওয়ানি আদালত বা শ্রম আদালত, কী সিদ্ধান্ত দিতে পারে তা পূর্বাভাস দিয়ে পক্ষগুলোকে সমাধানে পৌঁছাতে সহায়তা করেন। এক্ষেত্রে শ্রম আইন ও নজিরভিত্তিক আইন সম্পর্কে নির্দিষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
- (৩) **রূপান্তরমূলক:** যেখানে তৃতীয় পক্ষ (মধ্যস্থতাকারী) পক্ষগুলোকে সক্ষম করে তোলেন এবং যেকোনো পর্যায়ে অন্য পক্ষের প্রয়োজন, স্বার্থ ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করেন। নাম থেকেই বোঝা যায়, এই ধরনটি এই ধারণার উপর নির্ভর করে যে প্রক্রিয়া চলাকালে সম্পর্ক এবং পক্ষগুলোর পরস্পরকে বোঝার ধরনে পরিবর্তন আসতে পারে।

মধ্যস্থতাকারীদের তিনটি বৃহৎ ক্ষেত্রে ভূমিকাও রয়েছে:

- **প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকা:** পক্ষগুলোর প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেওয়া এবং একটি ইতিবাচক কার্যসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা
- **তথ্যমূলক ভূমিকা:** কোনো মামলার বিস্তারিত বিষয় স্পষ্ট করা এবং পক্ষগুলোর কাছে বাস্তব তথ্য পৌঁছে দেওয়া।
- **সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার ভূমিকা:** পক্ষগুলোর অবস্থানের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে এনে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

৫.৩ মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, যার মধ্যে বিরোধ শুরু করা, অনুসন্ধান, পক্ষগুলোকে সম্পৃক্ত করা এবং নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত

মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার তিনটি প্রধান ধাপ রয়েছে মধ্যস্থতার প্রস্তুতি গ্রহণ, মধ্যস্থতা পরিচালনা এবং ফলাফল ও পরবর্তী অনুসরণমূলক কার্যক্রম।

নির্দিষ্ট কোনো সমঝোতার প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী:

- বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ করবেন।
- ঘটনার বিবরণ বা প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবেন।
- মধ্যস্থতা কীভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করবেন।
- মধ্যস্থতার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

মধ্যস্থতা পরিচালনার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী:

- মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া শুরু করবেন।
- বিষয়গুলো নির্ধারণ করবেন এবং পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচ্যসূচি নিয়ে একমত হবেন।
- পক্ষগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ও পারস্পরিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- নিষ্পত্তির জন্য সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ উপস্থাপন করবেন।
- পক্ষগুলোর চূড়ান্ত দরকষাকষিতে সহায়তা করবেন, তবে কোনো সমাধান চাপিয়ে দেবেন না।

মধ্যস্থতা শেষ হওয়ার পর মধ্যস্থতাকারীকে:

- চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।
- মধ্যস্থতা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।
- পক্ষগুলোর মধ্যে কোনো চুক্তি না হলে কিছু অনুসরণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, যেমন তথ্য-অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালনা করা, অথবা কিছু ক্ষেত্রে বিষয়টি সালিশি বা বিচারিক নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার সনদ ইস্যু করতে হবে।

মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার মূলভিত্তি:

কার্যপদ্ধতির দিক থেকে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া মধ্যস্থতাকারী এবং পক্ষগুলোর মধ্যে ধারাবাহিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিশেষ করে, মধ্যস্থতাকারী কখনও কখনও পক্ষগুলোর মধ্যকার বৈঠকের সভাপতির ভূমিকা পালন করেন। একই প্রক্রিয়ার অন্য সময়ে মধ্যস্থতাকারী এক পক্ষ বা অন্য পক্ষের সঙ্গে সরাসরি ও ব্যক্তিগতভাবে বৈঠক করেন। মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলোর সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করার এই অতিরিক্ত সুযোগই সমঝোতা প্রক্রিয়াকে পক্ষগুলোর মধ্যে সরাসরি আলোচনা ও দরকষাকষি থেকে আলাদা করে।

মধ্যস্থতার প্রকৃত মূল্য তখনই সৃষ্টি হয়, যখন পক্ষগুলো মধ্যস্থতাকারীর উপর এতটাই পূর্ণ আস্থা রাখে যে তাঁরা বিরোধের বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা, কৌশল এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য সংভাবে ও খোলামেলাভাবে তাঁর সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এর ফলে মধ্যস্থতাকারীর এমনভাবে আচরণ করা প্রয়োজন, যাতে পক্ষগুলোর মধ্যে আস্থা তৈরি হয় এবং তিনি নিরপেক্ষ, নৈতিক ও গোপনীয়তা রক্ষায় বিশ্বস্ত হিসেবে বিবেচিত হন।

যখন মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া সর্বোত্তমভাবে কাজ করে, তখন মধ্যস্থতাকারী বিরোধের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পক্ষগুলোর নিজেদের চেয়েও বেশি অবগত হয়ে ওঠেন। কারণ উভয় পক্ষই গোপনীয়ভাবে মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে এমন তথ্য ও জ্ঞান ভাগ করে নেয়, যা তারা একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেয়নি। মধ্যস্থতাকারী বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোর প্রকৃত অবস্থান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন এবং

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

বিরোধের উভয় পক্ষ সম্পর্কেই সেই জ্ঞান এককভাবে তাঁর কাছে থাকে। মধ্যস্থতাকারী জানান সমঝোতার সম্ভাবনা কোথায় রয়েছে। এরপর তার চ্যালেঞ্জ হলো এমনভাবে প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা, যা সেই মধ্যস্থতা ব্যবস্থাকে সহজতর করে।

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া, যা মালিক ও শ্রমিকদের একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় স্বেচ্ছামূলক নিষ্পত্তিতে পৌঁছাতে সহায়তা করার জন্য প্রণীত। এই প্রক্রিয়া সাধারণত বিরোধের প্রাথমিক দাখিল থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

বিরোধ শুরু: প্রক্রিয়াটি শুরু হয় যখন কোনো এক পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধ উত্থাপন, দাখিল করেন। সাধারণত এটি তখন ঘটে, যখন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পদ্ধতির মতো অভ্যন্তরীণ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কোনো পক্ষ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদস্যদের পক্ষে কাজ করা একটি ট্রেড ইউনিয়ন, আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধটি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সমঝোতাকারীর কাছে উপস্থাপন করে। এই ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ইঙ্গিত দেয় যে মতানৈক্য নিষ্পত্তির জন্য বাহ্যিক সহায়তা প্রয়োজন।

সমস্যাসমূহ অনুসন্ধান করা: পক্ষগুলোকে একত্রিত করার আগে, মধ্যস্থতাকারীকে প্রথমে সব দিক থেকে বিরোধটি বুঝে প্রস্তুতি নিতে হয়। এতে মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথকভাবে প্রাথমিক যোগাযোগ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে। মধ্যস্থতাকারী ঘটনার বিবরণ বা প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন, বিরোধের মূল বিষয়গুলো চিহ্নিত করেন এবং প্রতিটি পক্ষের অবস্থান মূল্যায়ন করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে মধ্যস্থতাকারী মধ্যস্থতা বৈঠকগুলো কীভাবে পরিচালনা করবেন এবং কীভাবে ফলপ্রসূ আলোচনা সহজতর করবেন, তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

পক্ষগুলোকে সম্পৃক্ত করা: এটি মধ্যস্থতার কেন্দ্রীয় ধাপ। যেখানে মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলোকে একটি যৌথ বৈঠকে একত্রিত করেন। মধ্যস্থতাকারী সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করেন, বিচারকের ভূমিকা পালন করেন না। তাঁদের ভূমিকা হলো মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া শুরু করা, মৌলিক নিয়মাবলি স্থাপন করা এবং পক্ষগুলোকে বিষয়সমূহ নির্ধারণ ও আলোচ্যসূচিতে একমত হতে সহায়তা করা। এরপর তাঁরা আলোচনা পরিচালনা করেন, সম্মানজনক সংলাপকে উৎসাহিত করেন এবং নিশ্চিত করেন যে প্রত্যেক পক্ষ তাদের মতামত উপস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো পক্ষগুলোকে অনমনীয় অবস্থান থেকে সরিয়ে আরও নমনীয়, সমস্যা-সমাধানমুখী মানসিকতার দিকে এগিয়ে নেওয়া।

নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো: এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো পক্ষগুলোকে স্বেচ্ছামূলক নিষ্পত্তিতে পৌঁছাতে সহায়তা করা। মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলোকে বিভিন্ন বিকল্প অনুসন্ধান করতে এবং পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানের দিকে দরকষাকষি করতে সহায়তা করেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মধ্যস্থতাকারী কোনো সমাধান চাপিয়ে দেবেন না বা আরোপ করবেন না; বরং পক্ষগুলোকে নিজেদের সমাধান নিজেরাই খুঁজে বের করতে সক্ষম করবেন। একবার একটি চুক্তিতে পৌঁছানো গেলে, সমঝোতাকারীর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে চুক্তিটি স্পষ্ট এবং আইনগতভাবে সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য খসড়া প্রস্তুত করা। তারপর এর ফলাফল নথিভুক্ত করে একটি আনুষ্ঠানিক মধ্যস্থতা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। যদি কোনো নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো না যায়, তাহলে সমঝোতাকারীর প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকবে যে সমঝোতা সফল হয়নি। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বিরোধটি আরও আনুষ্ঠানিক সালিশি বা বিচারিক নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায়, যেমন শ্রম আদালতে, অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়।

সমঝোতা বা মধ্যস্থতার সুবিধাসমূহ:

মধ্যস্থতা প্রায়ই স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে কোনো সমস্যার সুস্পষ্ট একক উত্তর থাকে না। মধ্যস্থতার সুবিধাসমূহ হলো:

- প্রক্রিয়ার ফলাফলের নিয়ন্ত্রণ পক্ষগুলোর হাতেই থাকে।
- এটি একটি নমনীয় প্রক্রিয়া।
- এটি একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া।
- এটি শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া।
- এটি বিচারিক বা সালিশি সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তা এড়ায়।

- এটি বিরোধের উদ্ভাবনী ও কল্পনাপ্রসূত নিষ্পত্তির সুযোগ করে দেয়।
- এটি পক্ষগুলোর চলমান সম্পর্ক সুরক্ষিত রাখতে পারে, কারণ এটি সালিশির তুলনায় এটি কম সংঘাতপূর্ণ।

৬. সালিশি প্রক্রিয়া

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে সাধারণত একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সালিশির ব্যবস্থা করা উচিত। এটি বিরোধকে একটি নতুন স্তরে নিয়ে যায়, কারণ এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষকে এমন একটি সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যা চূড়ান্ত এবং বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক। ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে এখন সালিশি শুনানিতে উপস্থাপিত প্রমাণ, সাক্ষীর বক্তব্য এবং জেরার ভিত্তিতে সালিশিকারীর রোয়েদাদ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তি হয়।

সালিশিকারীর প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে বিরোধটির নিষ্পত্তি হতে পারে। তবে এর ফলাফল উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করবে—এমন সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ, বিরোধটির নিষ্পত্তি হতে পারে, কিন্তু তা সবসময় বিরোধের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলোর প্রকৃত সমাধান নিশ্চিত করে না।

সালিশিকারীর সিদ্ধান্তের ফলে বিরোধে জড়িত পক্ষগুলো ভবিষ্যতে পরস্পরের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে বিরোধাত্মক মনোভাব গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যেখানে সমস্যা সমাধানে ঐকমত্যভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

এসব বিষয় বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংগঠনের স্বাধীনতা বিষয়ক কমিটি বারবার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বিরোধের পক্ষগুলোকে সালিশিতে যেতে বাধ্য করা উচিত নয় (অর্থাৎ বাধ্যতামূলক সালিশির অধীন করা উচিত নয়) যদি না পক্ষগুলো:

- অত্যাবশ্যকীয় সেবায় জড়িত থাকে; অথবা
- রাষ্ট্রের নামে কর্তৃত্ব প্রয়োগকারী সরকারি শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে; অথবা
- মধ্যস্থতা ব্যর্থ হলে সালিশিতে উপস্থাপিত হতে সম্মত হয়ে থাকে।

কার্যকর সালিশির জন্য সালিশিকারীর উচিত পক্ষগুলোকে সালিশি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ দেওয়া এবং প্রয়োজনে তাদের সে পথে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা। একই সঙ্গে, সালিশিকারীকে ‘সালিশি করা, পক্ষসমর্থন নয়’—এই নীতি অনুসরণ করতে হবে; অর্থাৎ তিনি কোনো পক্ষের হয়ে যুক্তি উপস্থাপন বা তাদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবেন না।

৬.১ সালিশির সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

সালিশি হলো বিরোধ নিষ্পত্তির এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে একজন স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ উভয় পক্ষের বক্তব্য ও যুক্তি বিবেচনা করে এমন একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যা বিরোধে জড়িত উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক।

সালিশি বাধ্যতামূলক বা স্বৈচ্ছামূলক হতে পারে।

- বাধ্যতামূলক সালিশি হলো আইন দ্বারা নির্ধারিত সালিশি।
- চুক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক সালিশি হলো যৌথ চুক্তির অধীনে পক্ষগুলোর স্বৈচ্ছায় সম্পাদিত এমন মধ্যস্থতার ফল। যার মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে ওই চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন সালিশিকারীর কাছে উপস্থাপন করতে সম্মত হয়।
- স্বৈচ্ছামূলক সালিশি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পর শ্রমিক পক্ষ ও ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মতপার্থক্যের বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য একজন সালিশিকারীর কাছে উপস্থাপন করে।

মূলত, সালিশি হলো বিরোধ নিষ্পত্তির এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে সালিশিকারী নামে পরিচিত একজন স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ মালিক এবং শ্রমিক অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থাপিত যুক্তি শোনেন। সব প্রমাণ ও অবস্থান বিবেচনা করার পর সালিশিকারী একটি আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। এই সিদ্ধান্তকে সালিশি রায় বা রোয়েদাদ বলা হয়।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

সালিশির প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত আদালতে দীর্ঘ এবং প্রায়ই বেশি ব্যয়বহুল মামলা-মোকদ্দমার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়ে কোনো বিরোধের আইনসম্মত ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রদান করা। এটি বিশেষভাবে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকর, যেখানে প্রয়োগ করার মতো কোনো সুস্পষ্ট আইনগত অধিকার বা প্রতিষ্ঠিত বিধি থাকে না। কারণ এতে একজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত ফলাফল নির্ধারণ করতে পারেন। সালিশি এর নমনীয়তা ও গোপনীয়তা এবং বিচারিক নিষ্পত্তির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হওয়ায় পক্ষগুলোর পারস্পরিক চলমান সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এটি কার্যকর বলে বিবেচিত হয়।

আদালত বা শ্রম ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারিক নিষ্পত্তি হলো বিরোধ নিষ্পত্তির সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক ও আইনভিত্তিক পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলো তাঁদের বিরোধ কেবল চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় পক্ষের কাছেই নয়, বরং এমন একটি প্রক্রিয়ার কাছেও সমর্পণ করে। এটি আনুষ্ঠানিক, আইনভিত্তিক, ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং এক্ষেত্রে প্রায়ই বিলম্বিত হয়। পাশাপাশি এমন ফলাফলের সম্ভাবনাও থাকে, যা কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট নাও করতে পারে। সালিশির মতোই, এ ক্ষেত্রেও বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে, আবার তা আবশ্যিকভাবে এমন সমাধান নাও হতে পারে যা উভয় পক্ষের জন্য উপকারী।

৬.২ সালিশকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব

সালিশকারী বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করেন, যার চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। তাদের দায়িত্বসমূহ ব্যাপক এবং তা পালনের জন্য উচ্চমানের দক্ষতা, জ্ঞান ও সততা প্রয়োজন।

মূল কার্যাবলি:

- **পক্ষপাতহীনতা ও নিরপেক্ষতা:** সালিশকারীর সবচেয়ে মৌলিক দায়িত্ব হলো সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতহীন থাকা। বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোর সঙ্গে তার এমন কোনো ব্যক্তিগত বা পেশাগত সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, যা স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। তাঁদের কাজ হলো কোনো পক্ষপাত ছাড়াই বিষয়টি শোনা এবং কেবল উপস্থাপিত প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করা।
- **মামলা ব্যবস্থাপনা:** সালিশকারী পুরো সালিশি প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল। এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে:
 ১. **পদ্ধতি নির্ধারণ:** শুনানির পদ্ধতিগত নিয়মাবলি নির্ধারণ করা, যেমন- সময়সূচি, উপস্থাপনার ক্রম এবং প্রমাণ-সংক্রান্ত নিয়মাবলি।
 ২. **সময়সূচি নির্ধারণ:** সব বৈঠক ও শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা, যাতে প্রক্রিয়াটি দক্ষ ও সময়োপযোগী হয়।
 ৩. **শুনানি পরিচালনা সহজতর করা:** শৃংখলা বজায় রাখা, উভয় পক্ষকে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপনের ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করা এবং কার্যধারার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
- **তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ:** শুনানির সময় সালিশকারীর প্রধান দায়িত্ব হলো তথ্য অনুসন্ধানকারীর ভূমিকা পালন করা। এক্ষেত্রে তাঁদের:
 ১. **সক্রিয়ভাবে শুনতে হবে:** সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং আইনজীবী বা প্রতিনিধিদের যুক্তির প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে।
 ২. **প্রমাণ পর্যালোচনা করতে হবে:** উভয় পক্ষের দাখিল করা সব নথি, উপাত্ত এবং অন্যান্য প্রমাণ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে হবে।
 ৩. **প্রশ্ন করতে হবে:** তথ্য ও অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হলে যেকোনো পক্ষকে স্পষ্টীকরণমূলক প্রশ্ন করতে হস্তক্ষেপ করতে হবে।
- **আইনগত ও ব্যাখ্যামূলক কর্তৃত্ব:** অধিকার-সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে সালিশকারীকে মামলার তথ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আইন, যৌথ চুক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে হবে।

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** সালিশকারীর চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো একটি স্পষ্ট, যুক্তিসম্মত এবং বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করা, যা সালিশি রায় বা রোয়েদাদ নামে পরিচিত। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই:

১. **লিখিত হতে হবে:** রোয়েদাদ বা রায়টি আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত আকারে নথিভুক্ত করতে হবে।
২. **সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে:** সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রদান করতে হবে যেখানে প্রমাণ ও যুক্তিসমূহ কীভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে তা ব্যাখ্যা করতে হবে।
৩. **চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হতে হবে:** সিদ্ধান্তটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে যা পক্ষগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।

মূলত, সালিশকারীর ভূমিকা হলো একজন ন্যায্য, জ্ঞানসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তদাতা হিসেবে কাজ করা, যিনি বিরোধকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর্যায়ে নিয়ে যান। প্রক্রিয়াটি যেন সম্মানিত হয় এবং ফলাফল যেন সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য তার দায়িত্ব পালনে আইনগত দক্ষতা, পদ্ধতিগত ন্যায্যতা এবং চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন।

৬.৩ সালিশি প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, যার মধ্যে সালিশিতে যাওয়ার চুক্তি, সালিশকারী নিয়োগ, শুনানি পরিচালনা এবং রায় কার্যকর করা ইত্যাদি বিষয়গুলো রয়েছে

সালিশি প্রক্রিয়ার তিনটি প্রধান ধাপ রয়েছে সালিশির প্রস্তুতি গ্রহণ, সালিশি পরিচালনা এবং সালিশি রায় বা রোয়েদাদ লেখা।

সালিশির প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সালিশকারী:

- সালিশি প্রক্রিয়া এবং শুনানির সময় ও স্থান সম্পর্কে পক্ষগুলোকে জানাতে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সালিশকারী কোনো পক্ষের সঙ্গে মামলার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন না।
- প্রয়োজন হলে সাক্ষী ও বিশেষজ্ঞদের তলব করবেন।

সালিশি পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল গুরুত্ব থাকে শুনানির উপর। শুনানির সময়:

- সালিশকারী কার্যধারা শুরু করবেন।
- প্রত্যেক পক্ষ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করবে।
- স্পষ্টীকরণের জন্য সালিশকারী প্রশ্ন করতে পারেন।
- নির্দিষ্ট বিষয় স্পষ্ট করার জন্য সাক্ষী ও বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
- ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সুযোগ থাকতে পারে।

শুনানির পর সালিশকারীকে তাঁর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে একটি সালিশি রায় বা রোয়েদাদ লিখতে হবে। সিদ্ধান্তটি সতর্কতার সঙ্গে লিখতে হবে, যাতে কোনো অস্পষ্টতা না থাকে এবং রায়ের ব্যাখ্যা থেকে নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়। জাতীয় আইন ও প্রচলিত চর্চার উপর নির্ভর করে রায়:

- কেবল সালিশকারীর গৃহীত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে; অথবা
- সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সেই সিদ্ধান্তের কারণও উল্লেখ করা যেতে পারে।

সালিশি রায় উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক বা অবশ্য পালনীয়। তবে কোনো পক্ষ যদি রায়ের কোনো বিধান কার্যকর করতে অস্বীকার করে, তাহলে অন্য পক্ষকে সাধারণত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আদালতে আবেদন করতে হবে। আইনে এমনও বিধান থাকতে পারে যে, বিভিন্ন আইনগত ভিত্তিতে সালিশকারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করা যাবে।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

স্বেচ্ছামূলক সালিশি অথবা বাধ্যতামূলক সালিশি প্রক্রিয়া -

সালিশি প্রক্রিয়ার ধাপগুলো সম্পর্কে আরও বিশদভাবে বলা যায়, এটি বিরোধ নিষ্পত্তির একটি কাঠামোবদ্ধ ও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি। সাধারণত এটি সালিশিতে যাওয়ার প্রাথমিক চুক্তি থেকে শুরু করে সালিশিকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর করা পর্যন্ত কয়েকটি পৃথক ধাপ রয়েছে।

- **সালিশিতে যাওয়ার চুক্তি:** প্রক্রিয়াটি শুরু হয় বিরোধপূর্ণ পক্ষগুলোর মধ্যে তাঁদের দ্বন্দ্ব সালিশিতে উপস্থাপনের একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে। এই চুক্তি কোনো বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আগেই প্রণীত নির্দিষ্ট চুক্তিগত বিধান হতে পারে, যাকে চুক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক সালিশি বলা হয় অথবা বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পর পারস্পরিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হতে পারে, যাকে স্বেচ্ছামূলক সালিশি বলা হয়। চুক্তিতে অবশ্যই সালিশিকারী যে বিরোধ বিবেচনা করবেন, তার পরিসর স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে পক্ষগুলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।
 - **সালিশিকারী বা সালিশিকারীগণ নিয়োগ:** একবার চুক্তি সম্পাদিত হলে পক্ষগুলোকে সালিশিকারী বা সালিশিকারীগণ নির্বাচন করতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, কারণ সালিশিকারীর নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা প্রক্রিয়ার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য অপরিহার্য। নির্বাচন কয়েকভাবে করা যেতে পারে:
 ১. পক্ষগুলো পারস্পরিকভাবে একজন একক সালিশিকারীর বিষয়ে সম্মত হতে পারে।
 ২. প্রত্যেক পক্ষ নিজ নিজ সালিশিকারী নিয়োগ করতে পারে এবং ওই দুইজন সালিশিকারী যৌথভাবে একটি সালিশি প্যানেলের সভাপতিত্ব করার জন্য তৃতীয় একজন নিরপেক্ষ সালিশিকারী নির্বাচন করতে পারেন।
 ৩. তাঁরা কোনো সালিশি প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারি সংস্থার কাছ থেকে যোগ্য সালিশিকারীদের তালিকা চাইতে পারে।
 - **শুনানি পরিচালনা:** শুনানি হলো সালিশি প্রক্রিয়ার মূল অংশ। এটি আদালতের কার্যধারার মতো হলেও সাধারণত তুলনামূলকভাবে কম আনুষ্ঠানিক। সালিশিকারী শুনানির নিয়ম নির্ধারণ করেন এবং উভয় পক্ষ তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পায়।
 ১. **উদ্বোধনী বক্তব্য:** উভয় পক্ষ তাঁদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এবং তাঁরা যে প্রতিকার চায় তা উপস্থাপন করেন।
 ২. **প্রমাণ উপস্থাপন:** পক্ষগুলো তাঁদের দাবি সমর্থনের জন্য নথি বা কাগজপত্র, রেকর্ড এবং অন্যান্য প্রমাণ উপস্থাপন করেন।
 ৩. **সাক্ষীর সাক্ষ্য:** প্রত্যেক পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকা হয় এবং তাঁদের জেরার মুখোমুখি হতে হয়।
 ৪. **সমাপনী বক্তব্য:** প্রত্যেক পক্ষ তাঁদের যুক্তির চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ প্রদান করে এবং নিজেদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে।
- শুনানির সময় সালিশিকারীর ভূমিকা হলো ন্যায্যতা নিশ্চিত করা, কার্যধারা পরিচালনা করা এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করা।
- **সালিশি রায় প্রদান:** শুনানি শেষ হওয়ার পর সালিশিকারী বিবেচনা-পর্যালোচনা করেন এবং একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করেন, যা সালিশি রায় বা ‘রোয়েদাদ’ নামে পরিচিত। এই রায় বা রোয়েদাদ অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং এটি সাধারণত সিদ্ধান্তের একটি স্পষ্ট যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করে। রায় বা রোয়েদাদটি উভয় পক্ষের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক এবং এটি চূড়ান্তভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করে।
 - **রায় বা রোয়েদাদ কার্যকর করা:** রায় আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক হলেও কোনো এক পক্ষ তা মানতে অস্বীকার করতে পারে। এমন ক্ষেত্রে, অন্য পক্ষকে রায়টি আইনগতভাবে কার্যকর করার জন্য আদালতে যেতে হবে। আদালতের ভূমিকা হলো বিরোধের মূল বিষয় পুনরায় পরীক্ষা করা নয়; বরং সালিশি চুক্তি এবং রায়ের বৈধতা নিশ্চিত করা। যাতে অমান্যকারী পক্ষকে সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য করা যায়।

কে সালিশকারী হতে পারেন?

সালিশি সেবা প্রদান করা যেতে পারে:

- বেসরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে, যেখানে উভয় পক্ষ তাঁদের বিরোধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য একজন ব্যক্তির বিষয়ে সম্মত হয়।
- সরকারের মাধ্যমে।

সালিশি করা যেতে পারে:

- একজন একক সালিশকারীর মাধ্যমে।
- একটি সালিশি বোর্ডের মাধ্যমে।

একজন একক সালিশকারী মামলাটি বিবেচনা করলে সুবিধা হলো, বোর্ডকে বিরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে যে সময় লাগে, তার তুলনায় এতে কম সময় লাগে। এটি শুনানি এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সালিশি বোর্ড হতে পারে:

- ত্রিপক্ষীয়, যেখানে একজন নিরপেক্ষ স্বাধীন সালিশকারীর পাশাপাশি শ্রমিক ও মালিক সংগঠন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন।
- গঠনে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন।

ত্রিপক্ষীয় সালিশি বোর্ডের সুবিধার মধ্যে রয়েছে সদস্য হিসেবে শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি। যা বিরোধের মূল পরিস্থিতি অনুধাবন করা আরও সহজ করে তোলে।

নিরপেক্ষ বোর্ডের সুবিধার মধ্যে রয়েছে যে এতে একাধিক বিশেষজ্ঞ থাকতে পারেন, যেমন আইনজীবী, অর্থনীতিবিদ, আর্থিক বিশেষজ্ঞ; যারা তাঁদের কারিগরি দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাগুলোর গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করতে পারেন।

সালিশি সংস্থা হতে পারে:

- অস্থায়ী (ad hoc), যা স্বেচ্ছামূলক সালিশির ক্ষেত্রে হতে পারে।
- স্থায়ী (permanent), যা আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক সালিশির ক্ষেত্রে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

একজন সালিশকারীর কোনো আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা, যেমন আইনজীবী বা অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। সালিশকারীর ভালো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যেমন:

- সাধারণভাবে অর্থনীতি সম্পর্কে।
- জাতীয় শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে।
- সালিশি শুনানিতে অনুসরণীয় পদ্ধতিসহ প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে।
- শ্রমিক ও মালিক সংগঠনসমূহ সম্পর্কে।
- যে নির্দিষ্ট শিল্পখাতে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, সে শিল্পখাত সম্পর্কে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সালিশকারীর প্রয়োজন:

- পক্ষপাতহীন হওয়া।
- ভালো বিশ্লেষণী দক্ষতা থাকা।

► বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি

- ধৈর্যশীল হওয়া।
- ভালো খসড়া তৈরির দক্ষতা থাকা।

সালিশির সুবিধাসমূহ:

সালিশির সুবিধাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

- এটি দরকষাকষি, সমঝোতা এবং মধ্যস্থতার তুলনায় কম সময়সাপেক্ষ হতে পারে।
- এটি পক্ষগুলোর মধ্যকার অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে।
- কিছু ক্ষেত্রে পক্ষগুলো সালিশিকারী নির্বাচন করে, যার ফলে তাঁরা বিরোধটির উপর এক ধরনের “মালিকানাধীন” অনুভব করে এবং এর ফলাফলের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে।
- এটি পক্ষগুলোকে এমন একটি শুনানির জন্য প্রস্তুত হতে বাধ্য করে, যেখানে তাদের যুক্তিগুলো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করা হবে। এটি তাঁদের মূল বিষয়গুলোর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে উৎসাহিত করতে পারে।

শুনানিতে আনুষ্ঠানিক আদালতের মতো কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। ফলে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে কম সংঘাতপূর্ণ হয়।

নোট

[illegible]

This image shows a full page of a document template designed for writing. It features approximately 28 evenly spaced, thin horizontal grey lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.



International
Labour
Organization

বাংলাদেশে শ্রম বিরোধ
প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি



Bangladesh Employers' Federation (BEF)